RMDAC

অধ্যায় ২

প্রাণীর পরিচিতি
Animal Identity

প্রধান শব্দাবলি (Key words)	
❒ দ্বিস্তরী প্রাণী	❒ সিলেন্টেরন
❒ মেসোগ্লিয়া	❒ নেমাটোসিস্ট
❒ মুকুলোদগম	❒ মিথোজীবিতা
❒ অ্যান্টেনা	❒ পুঞ্জাক্ষি
❒ ওমাটিডিয়া	❒ র‍্যাবডোম
❒ ওভিপজিটর	❒ ওভারিওল
❒ ডায়াপজ	❒ রূপান্তর
❒ স্ট্রীমলাইন্ড	❒ বৃদ্ধিরেখা
❒ ভেনাস হার্ট	❒ ফুলকা
❒ বায়ুথলি	❒ রেণুপোনা
❒ মৎস্য খনি	❒ মৎস্য অভয়াশ্রম

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাণীর বাস। বৈচিত্র্য রয়েছে এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্যগ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে। এসব প্রাণীর মধ্যে কোনটা সরল প্রকৃতির কেউ জটিল গঠনের অধিকারী। এ অধ্যায়ে আমরা হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রাণিজগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রাণিজগতের সকল সদস্যকে আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য বেশি সদৃশ প্রাণী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্ব। এসব পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সার্বিকভাবে সকল প্রাণীর পরিচিতি লাভ করা যায়।

২.১ প্রতীক প্রাণী : *Hydra* (হাইড্রা)

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❒ *Hydra*-র গঠন	পাঠ ১	*Hydra*-র বহির্গঠন
❒ *Hydra*-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া	পাঠ ২	*Hydra*-র অন্তর্গঠন : এপিডার্মিস
❒ *Hydra*-র চলন	পাঠ ৩	*Hydra*-র অন্তর্গঠন : গ্যাস্ট্রোডার্মিস
❒ *Hydra*-র জনন পদ্ধতি	পাঠ ৪	*Hydra*-র খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক
❒ *Hydra*-র মিথোজীবিতা	পাঠ ৫	*Hydra*-র চলন
❒ ব্যবহারিক : *Hydra* পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৬	*Hydra*-র জনন
	পাঠ ৭	*Hydra*-র মিথোজীবিতা ও শ্রমবণ্টন

Hydra হচ্ছে **নিডারিয়া** (Cnidaria) পর্বভুক্ত সরল গড়নের জলজ প্রাণী। প্রাণিজগতের দুটি পর্ব **দ্বিস্তরী** বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী** (diploblastic animal) নামে পরিচিত। একটি হচ্ছে **নিডারিয়া** (Cnidaria), অন্যটি **টিনোফোরা** (Ctenophora)। সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতিবিজ্ঞানী **আব্রাহাম ট্রেম্বলে** (Abraham Trembley, 1710-1784) ১৭৪৪ সালে হাইড্রার প্রচন্ড **পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা** প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রাণিপ্রকৃতিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে হাইড্রার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। এজন্য ট্রেম্বলেকেই হাইড্রার আবিষ্কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৭৫৮ সালে **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1707-1778) এর নাম দেন *Hydra*। গ্রিক রূপকথার নয় মাথাওয়ালা ড্রাগনের নামানুসারে *Hydra*-র নামকরণ করা হয়। ঐ ড্রাগনটির একটি মাথা কাটলে তার বদলে দুই বা তার বেশি মাথা গজাতো। *Hydra* ঐ ড্রাগনের মতো হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাই অনেক সময় বহু মাথাওয়ালা সদস্য আবির্ভূত হয়। মহাবীর **হারকিউলিস** (Hercules) অবশেষে এ দানবকে বধ করেন।

চিত্র ২.১.১ : হাইড্রা ড্রাগন

বাংলাদেশে *Hydra*-র বিভিন্ন প্রজাতি

বর্তমানে পৃথিবীতে *Hydra*-র প্রজাতি সংখ্যা ৪০টির মতো। গায়ের রং, কর্ষিকার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এবং জননাঙ্গের অবস্থান ও আকৃতির ভিত্তিতে হাইড্রার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ২০০৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের চতুর্দশ খণ্ডের (Bangladesh Encyclopedia of Flora and Fauna, vol. 14) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩ প্রজাতির হাইড্রার উল্লেখ পাওয়া যায়: ১. **বর্ণহীন বা হলুদ-বাদামী** *Hydra vulgaris*, ২. **সবুজ বর্ণের** *Hydra viridissima* (=*H. viridis, Chlorohyda viridissima*) এবং ৩. **বাদামী বর্ণের** *Hydra oligactis* (=*H. fusca*)।

বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*-র মধ্যে বাংলাদেশে *Hydra vulgaris* সুলভ বলে এখানে এ প্রজাতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাসস্থান ও স্বভাব : *Hydra* একটি একক **মুক্তজীবী প্রাণী**। মিঠাপানিতে (খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা) নিমজ্জিত কঠিন বস্তু এবং জলজ উদ্ভিদের পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সংলগ্ন থেকে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে। স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি পাওয়া যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের খুব কম পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেহ ও কর্ষিকাকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে পানিতে দুলতে থাকে। কোন কিছুর সংস্পর্শে দেহকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। এগুলো **মাংসাশী** (অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে)। কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। চলাফেরা করে দেহের সঙ্কোচন-প্রসারণ ও কর্ষিকার সাহায্যে। দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় শ্বসন ও রেচন সম্পন্ন করে। মুকুলোদগম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন এবং জননকোষ সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে। ***Hydra*-র পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতা প্রচন্ড।

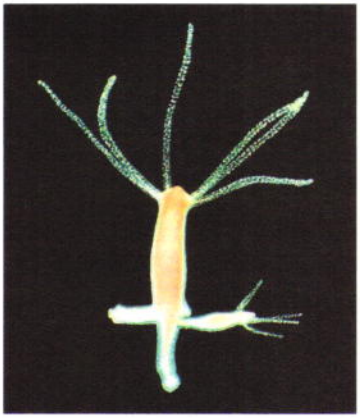
Hydra vulgaris

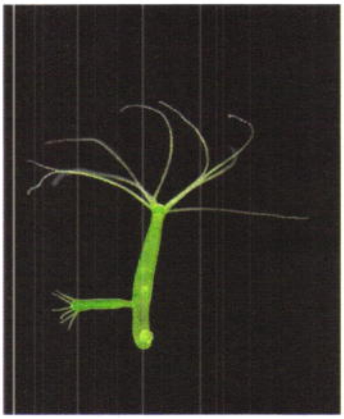
Hydra viridissima

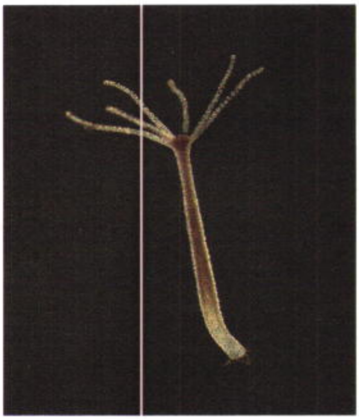
Hydra oligactis

চিত্র ২.১.২ : প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)

Phylum : Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)

Class : Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)

Order : Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)

Family : Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)

Genus : *Hydra* (পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)

Species : *Hydra vulgaris*

Hydra-র বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আকার-আকৃতি : *Hydra*-র দেহ নরম ও অনেকটা নলাকার। দেহের একপ্রান্ত খোলা (ওরাল বা মৌখিক প্রান্ত) এবং অপরপ্রান্ত বন্ধ (অ্যাবওরাল বা বিমৌখিক প্রান্ত)। খোলা প্রান্তে মুখছিদ্র অবস্থিত, আর বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত থাকে। দেহ **অরীয় প্রতিসম** (radial symmetry) এবং ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা ও প্রায় ১ মিলিমিটার চওড়া।

বর্ণ : প্রজাতিভেদে *Hydra*-র বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। *Hydra vulgaris* প্রায় বর্ণহীন (হালকা হলুদ-বাদামী), তবে গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

বহির্গঠন : একটি পরিণত *Hydra*-র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : ১. **হাইপোস্টোম**, ২. **দেহকান্ড** ও ৩. **পদতল** বা **পাদ-চাকতি** । নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো ।

১. হাইপোস্টোম (Hypostome) : এটি দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকার, ছোট ও সঙ্কোচন-প্রসারণশীল অংশ । এর চূড়ায় বৃত্তাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত ।

কাজ: মুখছিদ্রপথে খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয় ।

২. দেহকান্ড (Trunk) : হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির উপর পর্যন্ত সঙ্কোচন-প্রসারণশীল অংশটি দেহকাণ্ড । এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায় ।

- **কর্ষিকা (Tentacle) :** হাইপোস্টোমের গোড়ার চারদিক ঘিরে ৬-১০টি সরু, সঙ্কোচনশীল, দেহ অপেক্ষা লম্বা ও ফাঁপা সুতার মতো কর্ষিকা অবস্থিত । কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে অসংখ্য ছোট টিউমারের মতো **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী** (nematocyst battery) থাকে । প্রত্যেক ব্যাটারীতে থাকে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট ।

  কাজ: কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় আহার সংগ্রহ, চলন এবং আত্মরক্ষায় অংশ নেয় ।

- **মুকুল (Bud) :** গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত আহার পাওয়া যায় তখন মুকুল সৃষ্টিরও অনুকূল সময় । এমন পরিবেশে দেহের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক **মুকুল** সৃষ্টি হয় ।

  কাজ: প্রত্যেক মুকুল একেকটি নতুন সদস্যের জন্ম দেয় । মুকুলোদগম *Hydra*-র অন্যতম অযৌন জনন প্রক্রিয়া ।

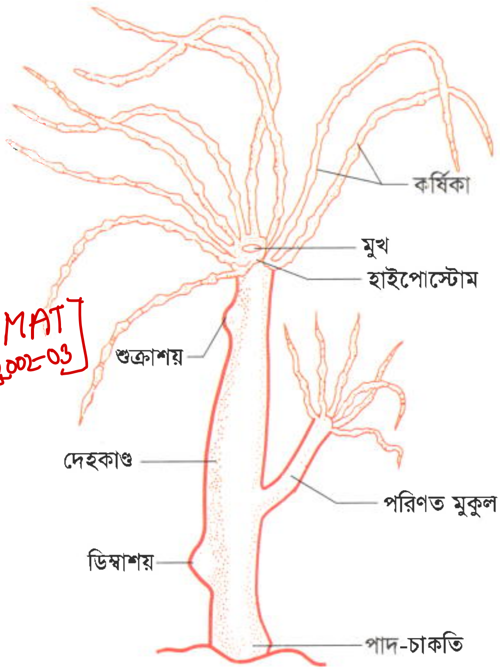

চিত্র ২.১.৩ : *Hydra*-র বহির্গঠন

- **জননাঙ্গ (Gonad) :** হেমন্ত ও শীতকালে দেহকাণ্ডের উপরের অর্ধাংশে এক বা একাধিক কোণাকার **শুক্রাশয়** (testes) এবং নিচের অর্ধাংশে এক বা একাধিক গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovaries) নামক অস্থায়ী জননাঙ্গ দেখা যায় ।

  কাজ: জননাঙ্গ যৌন জননে অংশগ্রহণ করে ।

৩. পাদ-চাকতি (Pedal disc) : দেহকাণ্ডের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত গোল ও চাপা অংশটি **পাদ-চাকতি** বা **পদতল** ।

কাজ: পাদ-চাকতি থেকে ক্ষরিত আঠালো রসের সাহায্যে প্রাণী কোনো তলের সাথে লেগে থাকে । এ চাকতি **বুদবুদ** (bubble) সৃষ্টি করে প্রাণীকে ভাসিয়ে রাখতেও সাহায্য করে । চাকতির ক্ষণপদ গঠনকারী কোষের সাহায্যে **গ্লাইডিং চলন** সম্পন্ন হয় ।

দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী (Diploblastic Animal)

ভ্রূণাবস্থায় যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী বলে । পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস**-এ পরিণত হয় । এ দুস্তরের মাঝখানে **মেসোগ্লিয়া** (mesogloea) নামক **অকোষীয়** ও **জেলির মতো** (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) একটি স্তর থাকে । *Hydra* **দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীর এক আদর্শ উদাহরণ** ।

Hydra -র অন্তর্গঠন (Internal Structure of *Hydra*)

Hydra-র দেহের অন্তর্গঠন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির । কোষ-টিস্যু মাত্রার প্রাণী হওয়ায় এদের অন্তর্গঠনে কোনো জটিল টিস্যু, টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র দেখা যায় না । দেহের অন্তর্গঠনে মূলত দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা-**দেহপ্রাচীর** এবং **সিলেন্টেরন** ।

দেহপ্রাচীরের কোষের গঠন-বৈশিষ্ট্য (Cellular Morphology of Body Wall)

Hydra-র দেহের চারদিকে অবস্থিত কোষনির্মিত আবরণটিকে **দেহপ্রাচীর** বলে। এটি সিলেন্টেরনকে বেষ্টন করে অবস্থান করে। দেহপ্রাচীরের কোষগুলো দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে, যথা–বহিঃস্থ **এপিডার্মিস** ও অন্তঃস্থ **গ্যাস্ট্রোডার্মিস**। ভ্রূণাবস্থায় এ স্তরদুটি যথাক্রমে **এক্টোডার্ম** (ectoderm) ও **এন্ডোডার্ম** (endoderm) নামে পরিচিত। এ দুস্তরের মাঝখানে **মেসোগ্লিয়া** নামক এটি অকোষীয় স্তর থাকে। কাজেই পরিণত *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের তিনটি প্রধান অংশ দেখা যায়– **এপিডার্মিস, গ্যাস্ট্রোডার্মিস** ও **মেসোগ্লিয়া**। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

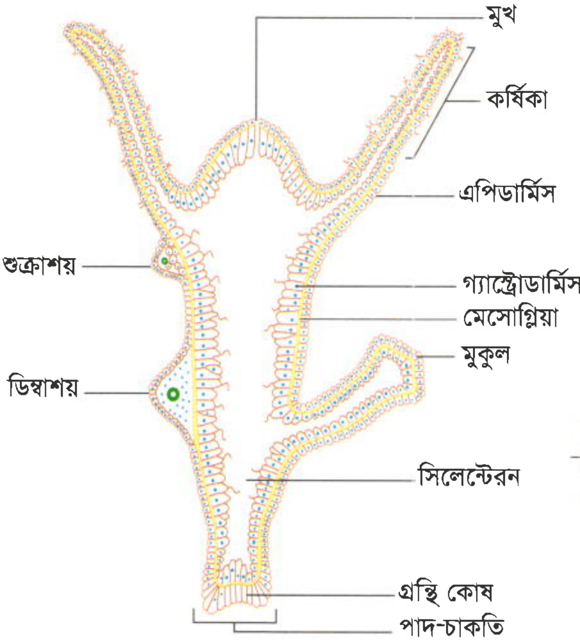

চিত্র ২.১.৪ : *Hydra*--র লম্বচ্ছেদ

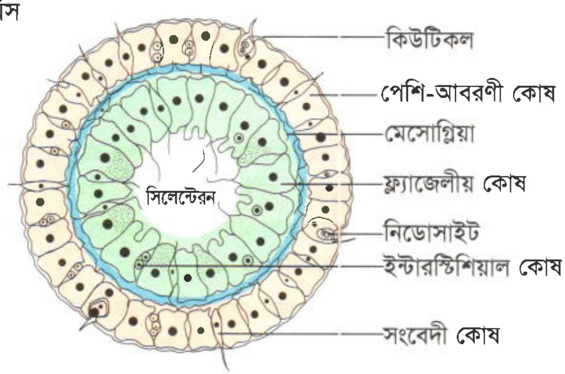

চিত্র ২.১.৫ : *Hydra*--র প্রস্থচ্ছেদ

কোষসমূহ

১. পেশি-আবরণী কোষ
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
৩. সংবেদী কোষ
৪. স্নায়ু কোষ
৫. গ্রন্থি কোষ
৬. জনন কোষ এবং
৭. নিডোসাইট

কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।

১. পুষ্টি কোষ
২. গ্রন্থি কোষ
৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ,
৪. সংবেদী কোষ এবং
৫. স্নায়ু কোষ।

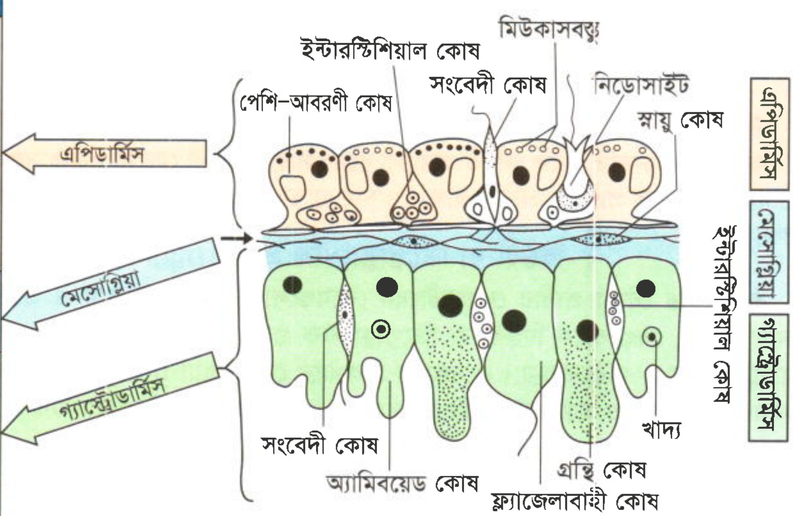

চিত্র ২.১.৬ : *Hydra*--র দেহপ্রাচীরের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

এপিডার্মিস বা বহিঃত্বক–এর কোষসমূহ

কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি পাতলা ও নমনীয় **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত **এপিডার্মিস** *Hydra*-র বহিরাবরণ গঠন করে। *Hydra*-র এপিডার্মিস নিচে বর্ণিত সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

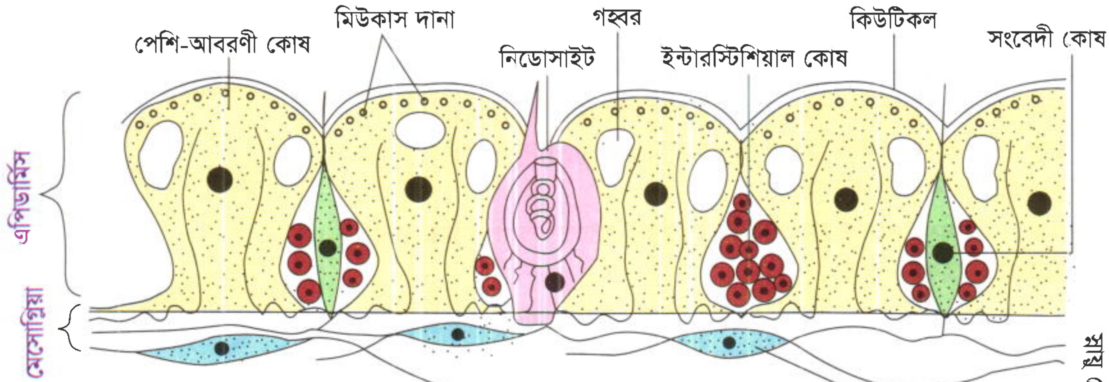

চিত্র ২.১.৭ : *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষসমূহ

① পেশি-আবরণী কোষ (Musculo-Epithelial Cell) : এপিডার্মিসের অন্যান্য কোষের তুলনায় পেশি-আবরণী কোষগুলো আকারে বড় এবং সংখ্যায় বেশি। কোষগুলো কোণাকার বা নাসপাতি আকৃতির এবং এপিডার্মিসের সম্পূর্ণ পুরুত্ব বরাবর মেসোগ্লিয়ার উপর অবস্থান করে। [MAT: 2018-19] প্রতিটি কোষে একটি বড় নিউক্লিয়াস, অনেকগুলো গহ্বর এবং আদর্শ প্রাণিকোষে উপস্থিত সকল অঙ্গাণুই থাকে। প্রতিটি কোষের বাইরের চওড়া প্রান্তে একসারি গোলাকার **মিউকাস দানা** থাকে। কোষের ভিতরের সরু প্রান্তের দুপাশে প্রসারিত অভিক্ষেপ দেখা যায়। এদের **পেশি লেজ** বা **পেশি প্রবর্ধক** বলে। পেশি লেজে সুতার মতো **মায়োনিম** (myoneme) থাকে। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে **নিডোব্লাস্ট** (পরিস্ফুটনরত নিডোসাইট) ধারণ করে। পেশি-আবরণী কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম।

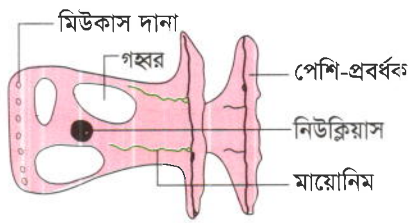

চিত্র ২.১.৮ : পেশি-আবরণী কোষ

কাজ: (i) **দেহাবরণ** নির্মাণের মাধ্যমে দেহকে রক্ষা করে। (ii) মিউকাস দানা নিঃসৃত রস **কিউটিকল** গঠনে অংশ নেয় ও দেহকে পিচ্ছিল রাখে। (iii) কর্ষিকায় এগুলো **নিডোব্লাস্ট** ধারণ করে। (iv) প্রবর্ধনগুলো সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেশির মতো কাজ করে প্রাণীর **চলন, খাদ্যগ্রহণ** ইত্যাদি কার্যক্রমে সাহায্য করে। (v) দেহকে কোনো বস্তুর সাথে **আবদ্ধ রাখতে** সাহায্য করে। (vi) মিউকাস দানা সমৃদ্ধ অংশ **শ্বসনে** অংশ নেয়।

② ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial Cell) : পেশি-আবরণী কোষের অন্তর্মুখী সরু প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকে, গুচ্ছাকারে, মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল, ডিম্বাকার বা তিনকোণা, ৫μm ব্যাসবিশিষ্ট এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত। কোষগুলো সম্মিলিতভাবে *Hydra*-র হাইপোস্টোমের নিচের দিকে একটি **বৃদ্ধি এলাকা** গঠন করে।

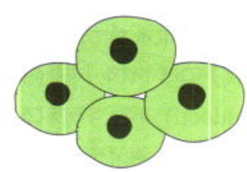

চিত্র ২.১.৯ : ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

[MAT- 2018-19, 2023-24]

কাজ : (i) এগুলো সাধারণত মুকুল, জননকোষ ও নিডোসাইট সৃষ্টিতে অংশ নেয়। (ii) প্রয়োজনে এগুলো যে কোনো ধরনের কোষে পরিণত হতে পারে। (iii) গ্যাস্ট্রোডার্মিসের নষ্ট হয়ে যাওয়া যে কোনো কোষ পুনর্গঠন করে। (iv) প্রাণীর পুনরুৎপত্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। (v) প্রতি ৪৫ দিন পর পর *Hydra*-র দেহের সব কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় (Brein, 1955)। কোষের এ বৈশিষ্ট্যকে **টটিপোটেন্ট** (totipotent) বলে।

৩. **সংবেদী কোষ (Sensory Cell) :** এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে, তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পাদ-চাকতির চারদিকে বেশি দেখা যায়। সব কোষ লম্বা ও সরু। এর মুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম **সংবেদী রোম** (sensory hair) বের হয় এবং অপর প্রান্ত থেকে গুটিকাময় (nodulated) সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়ে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত হয়।

চিত্র ২.১.১০ : সংবেদী কোষ

কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।

৪. **স্নায়ু কোষ (Nerve Cell) :** এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক নোডিওলযুক্ত সূক্ষ্ম শাখান্বিত **স্নায়ু রোম** নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে **স্নায়ু-জালিকা** গঠন করে।

কাজ : (i) সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে। (ii) দেহের বিভিন্ন কোষের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

চিত্র ২.১.১১ : স্নায়ু কোষ

৫. **গ্রন্থি কোষ (Gland Cell) :** এগুলো ক্ষরণকারী দানাবিশিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত লম্বাকৃতি এপিডার্মাল কোষ। মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে প্রচুর গ্রন্থি কোষ দেখা যায়।

কাজ : (i) **মিউকাস** ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকতে সাহায্য করে। (ii) **বুদবুদ** সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে। (iii) মুখছিদ্রের গ্রন্থি কোষের ক্ষরণ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।

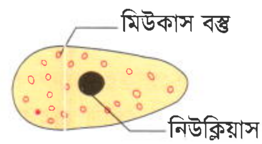

চিত্র ২.১.১২ : গ্রন্থি কোষ

৬. **জনন কোষ (Germ Cell) :** জননাঙ্গে জননকোষ অবস্থান করে। জননকোষ দুধরনের: **শুক্রাণু** ও **ডিম্বাণু**। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক**, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** ও একটি লম্বা বিচলনক্ষম **লেজ** নিয়ে গঠিত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল, এর সাথে তিনটি **পোলার বডি** (polar bodies) যুক্ত থাকে।

কাজ : **যৌন** জননে অংশগ্রহণ করা।

[MAT-2019-20]

৭. **নিডোসাইট (Cnidocyte) :** *Hydra*-র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বা ঐসব কোষের ভিতরে নিডোসাইট অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কোষগুলো গোল, ডিম্বাকার বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেষ্টিত বড় কোষ। কোষের মুক্তপ্রান্তে ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংবেদী **নিডোসিল** (cnidocil) এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাঁচানো সুতাযুক্ত **নেমাটোসিস্ট** বহন করে। গহ্বরটি **অপারকুলাম** (operculum) দিয়ে ঢাকা। আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) থাকে এবং গহ্বরটি **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে **নিডোব্লাস্ট** (cnidoblast) বলে।

কাজ : (i) *Hydra*-র শিকার ধরা ও অসাড় করার কাজে ব্যবহৃত হয়। (ii) চলনে সহায়তা করে। (iii) আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। (iv) প্রাণীকে কোনো বস্তু আঁকড়ে ধরার কাজে সাহায্য করে। (v) নিডোসাইটের শ্রেণিতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে।

আদর্শ নিডোসাইটের গঠন (Structure of a Typical Cnidocyte)

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. **আবরণ (Membrane) :** প্রত্যেক নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তরদুটির মাঝখানে দানাদার **সাইটোপ্লাজম** এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি **নিউক্লিয়াস** থাকে। সাইটোপ্লাজমে অন্যান্য সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে।

২. **নেমাটোসিস্ট (Nematocyst) :** নিডোসাইটের ভিতরে অবস্থিত, কাইটিনের মতো পদার্থে নির্মিত আবরণে আবৃত ও সূত্রকযুক্ত একটি ক্যাপসুলের নাম **নেমাটোসিস্ট**। আদর্শ নিডোসাইটে ক্যাপসুলটি **প্রোটিন ও ফেনল**-এ গঠিত বিষাক্ত তরল **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin)–এ পূর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রকটি যা প্রকৃতপক্ষে ক্যাপসুলেরই অগ্রপ্রান্তের অভিন্ন প্রসারিত অংশ সেটি অবস্থান করে। সূত্রকের চওড়া গোড়াটিকে **বাট** (butt) বা **শ্যাফট** (shaft) বলে। এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) ও সর্পিল সারিতে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রতর কাঁটার মতো অসংখ্য **বার্বিওল** (barbules) দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলির ভিতরে উল্টো অবস্থায় প্যাঁচানো থাকে।

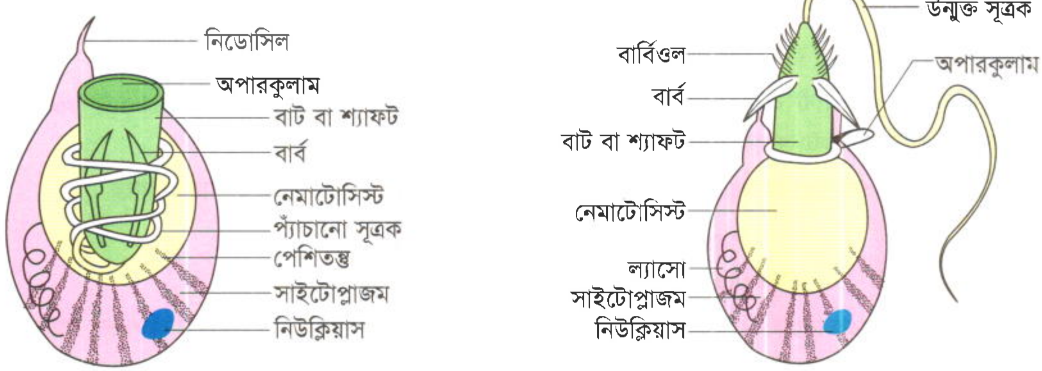

চিত্র ২.১.১৩ : নিডোসাইট: বায়ে-স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ডানে-সূত্রকটি প্রক্ষিপ্ত অবস্থায়

৩. **অপারকুলাম (Operculum) :** স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম **অপারকুলাম**। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়।

৪. **নিডোসিল (Cnidocil) :** নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাঁটাটি **নিডোসিল**। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রূপান্তরিত **সিলিয়াম** (cilium)। নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে ফলে অপারকুলাম সরে যায় এবং প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

৫. **পেশিতন্তু ও ল্যাসো (Muscle fibre & Lasso) :** কোষের সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সঙ্কোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে **ল্যাসো** নামের একটি প্যাঁচানো সূত্রক দেখা যায়।

নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of Nematocysts)

নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী **ভার্ণার** (Werner) ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের দেহ থেকে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত চার ধরনের নেমাটোসিস্ট *Hydra*-য় পাওয়া যায়।

১. **স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট (Stenotele or Penetrant) :** *Hydra*-র চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে এগুলোই বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত, বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ্ণ **বার্ব** ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র **বার্বিউলযুক্ত**। এর ভিতরে **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত তরল থাকে।

কাজ: শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে।

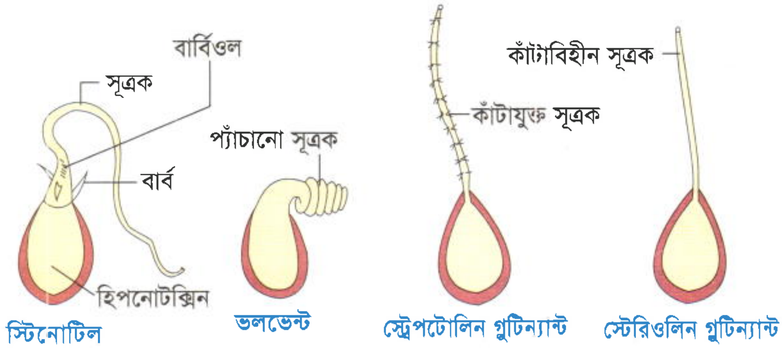

চিত্র ২.১.১৪ : বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট

২. ভলভেন্ট বা ডেসমোনিম (Volvent or Desmoneme) : এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট নেমাটোসিস্ট। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন ও বন্ধ শীর্ষযুক্ত। ক্যাপসুলের ভিতর সূত্রকের একটি মাত্র প্যাঁচ থাকে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাঁচের সৃষ্টি করে।

কাজ : এটি শিকার কিংবা কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৩. স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট বা হলোট্রিকাস আইসোরাইজা (Streptoline Glutinant or Holotrichous Isorhiza): এর সূত্রক লম্বা, দৈর্ঘ্য বরাবর সর্পিলাকারে সজ্জিত কাঁটাযুক্ত, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত।

কাজ : এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪. স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট বা অ্যাট্রিকাস আইসোরাইজা (Stereoline Glutinant or Atrichous Isorhiza) :

DAT-2017-18

এগুলো ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট; সূত্রক লম্বা, কাঁটাবিহীন, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত।

কাজ : এগুলোও এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল
(Mechanism of Discharge of Nematocyst-thread)

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি **রাসায়নিক** ও **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া**। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যে কোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোন শিকার *Hydra*-র কর্ষিকার কাছাকাছি হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এ সময় থলির ভিতর **পলি-γ-গ্লুটামেট** (poly-γ-glutamate) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়। শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় **হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ** (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

নেমাটোসিস্টের **সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না** বা আবার ব্যবহার করা যায় না কিংবা ঐ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমাটোসিস্ট সৃষ্টিও করতে পারে না। এ ধরনের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহৃত নিডোসাইট প্রতিস্থাপিত হয়।

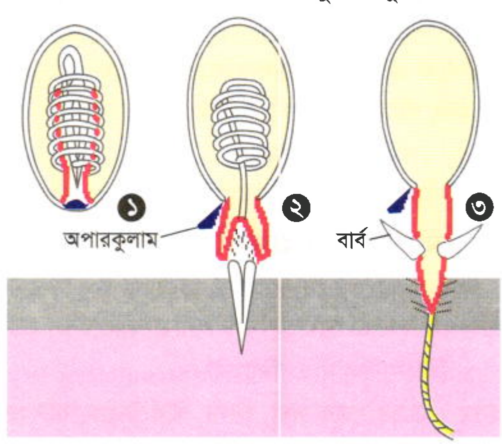

চিত্র ২.১.১৫ : নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ প্রক্রিয়া

নিডোসাইট ও নেমাটোসিস্টের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	নিডোসাইট	নেমাটোসিস্ট
১. অবস্থান	নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণিদের এপিডার্মিসের পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে বা ভিতরে।	নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশে।
২. গঠন	দ্বিস্তরী আবরণ, নিডোসিল, অপারকুলাম, নেমাটোসিস্ট, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।	ফাঁপা ও প্যাঁচানো সূত্রকযুক্ত একটি গোলাকার বা ডিম্বাকার থলি বিশেষ।
৩. আবরণ	সজীব প্লাজমামেমব্রেন দিয়ে গঠিত।	নির্জীব কাইটিন নির্মিত।
৪. প্রকৃতি	এপিডার্মিসের একপ্রকার বিশেষ ধরনের কোষ।	নিডোসাইট কোষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
৫. কাজ	নেমাটোসিস্ট ধারণ করে।	শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ও আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে।

গ্যাস্ট্রোডার্মিস বা অন্তঃত্বক-এর কোষসমূহ

Hydra-র দেহপ্রাচীরের অন্তঃস্তরকে **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** বলে। এটি সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে। ভ্রূণীয় **এন্ডোডার্ম** থেকে এটি গঠিত হয়। এটি পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত, যথা-**পেশি-আবরণী কোষ** বা **পুষ্টি কোষ**, **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ**, **সংবেদী কোষ**, **স্নায়ু কোষ** এবং **গ্রন্থি কোষ**। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. পেশি–আবরণী কোষ বা পুষ্টি কোষ (Musculo-epithelial Cell or Nutritive Cell) : কোষগুলো আকারে বড়, স্তম্ভাকার এবং অন্তঃত্বকের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকে। প্রত্যেক কোষে দানাদার সাইটোপ্লাজম, একটি বড় নিউক্লিয়াস, কয়েকটি গহ্বর এবং বিভিন্ন অঙ্গাণু বর্তমান। ভিতরের প্রান্তের শেষভাগের দুদিকে **পেশিলেজ** নামক দুটি উপবৃদ্ধি থাকে যা দেহঅক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। পেশিলেজের মধ্যে মায়োনিম নামক সংকোচনশীল তন্তু থাকে। কোষগুলো পুষ্টি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে বলে এগুলোকে **পুষ্টি কোষ** বলা হয়।

ভিতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের ভিত্তিতে পুষ্টি কোষগুলো দুরকম, যথা–

DAT 2019-20

i. **ফ্ল্যাজেলীয় কোষ (Flagellated Cell) :** এগুলোর মুক্ত প্রান্তে ১–৪টি সুতার মতো **ফ্ল্যাজেলা** যুক্ত থাকে।

ii. **ক্ষণপদীয় কোষ (Pseudopodial Cell) :** এগুলোর মুক্ত প্রান্ত থেকে এক বা একাধিক ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়।

পেশি-আবরণী কোষের কাজ : (i) **পেশি** প্রবর্ধনগুলো সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে। (ii) মুখ ও কর্ষিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো মুখের ছিদ্র খোলা ও বন্ধ করতে **স্ফিংক্টার** (sphincter)-এর মতো কাজ করে। (iii) ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। (iv) প্রয়োজনে এ কোষ আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করায়। (v) ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ করে অন্তঃস্থ খাদ্যগহ্বরে পরিপাক করে।

২. গ্রন্থি কোষ (Gland Cell) : বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলোর সংখ্যা মূলদেহ ও হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি, পদতলে কম এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত। (৪)

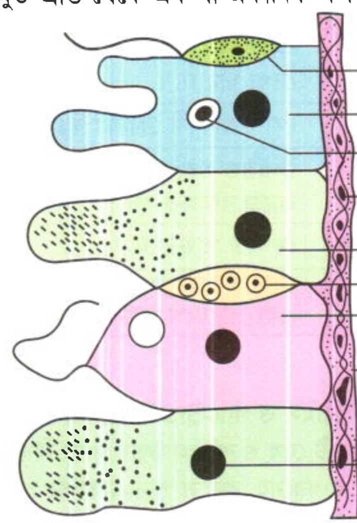

চিত্র ২.১.১৬ : *Hydra*-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ

গ্রন্থি কোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন। এগুলো দুরকম হয়ে থাকে–

i. মিউকাস ক্ষরণকারী (Mucous secreting) : এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পিচ্ছিল মিউকাস ক্ষরণ করে।

ii. এনজাইম ক্ষরণকারী (Enzyme secreting) : অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের যা থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরিত হয়। এগুলো বহিঃকোষীয় পরিপাকে অংশ গ্রহণ করে।

গ্রন্থি কোষের কাজ : (i) হাইপোস্টোমের গ্রন্থি কোষ নিঃসৃত **মিউকাস** খাদ্যদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। (ii) অন্যান্য স্থানের গ্রন্থি কোষ সিলেন্টেরনে **এনজাইম**-এর ক্ষরণ ঘটিয়ে পরিপাকে সাহায্য করে।

৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial Cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এসব এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ। এগুলো গোল, ডিম্বাকার বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে।

কাজ : এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ।

৪. সংবেদী কোষ (Sensory Cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত লম্বা ও সরু কোষ। কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে নির্গত সূক্ষ্ম **সংবেদী রোম** সিলেন্টেরনে উদগত এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত থেকে নির্গত রোম স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : পানির সাথে সিলেন্টেরনে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে।

৫. স্নায়ু কোষ (Nerve Cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সংখ্যায় খুব কম। অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে **স্নায়ু জালিকা** গঠন করে।

কাজ : (i) সংবেদী কোষ থেকে সংগৃহীত উদ্দীপনার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। (ii) দেহের বিভিন্ন কোষের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১. উৎপত্তি	ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।	এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।
২. অবস্থান	দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত।	দেহের ভিতরের দিকে অর্থাৎ সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে।
৩. পুষ্টি কোষ	ক্ষণপদযুক্ত কোষ ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ দেখা যায় না।	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।
৪. কিউটিকল	পেশি-আবরণী কোষের নিঃসৃত রসে সৃষ্টি হয়।	অনুপস্থিত।
৫. নিডোসাইট	উপস্থিত এবং চলন, শিকার ধরা ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।	অনুপস্থিত।
৬. জনন অঙ্গ ও মুকুল	দেখতে পাওয়া যায়।	নেই।
৭. কাজ	দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে।	মূলত পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।

মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Hydra-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে **মেসোগ্লিয়া** বলে। মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ ও কর্ষিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত, তবে কর্ষিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ-চাকতিতে সর্বাধিক পুরু। মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ষিকাকে বেশি নমনীয়তা দান করে। *Hydra*-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্লিয়া গঠনে অংশ নেয়।

কাজ : (i) মেসোগ্লিয়া দেহের অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এক ধরনের নমনীয় **কঙ্কাল** হিসেবে কাজ করে। (ii) মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের **ভিত্তিরূপে** কাজ করে। (iii) স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্তুসমূহ এবং পেশি-আবরণী কোষের সঙ্কোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে। (iv) মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সঙ্কোচনশীল মায়োফাইব্রিলের সঙ্কোচনে দেহ বা কর্ষিকা খাটো হয় ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয়।

সিলেন্টেরন : পরিপাক–সংবহন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর (Coelenteron : Gastrovuscular Cavity)

Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণিদের (যেমন–*Hydra*) **দেহাভ্যন্তরে একপ্রান্ত খোলা যে একটি নলাকার ফাঁকা গহ্বর থাকে, তাকে সিলেন্টেরন বলে।** এটি গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত এবং মুখছিদ্র থেকে দেহের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত। এর উপস্থিতির কারণেই *Hydra*-র পর্বটি আগে Coelenterata নামে পরিচিত ছিল। সিলেন্টেরনের মধ্যে খাদ্যবস্তু ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় এবং পরে **বহিঃকোষীয় পরিপাক** ঘটে। কিছু খাদ্যকণা সিলেন্টেরনের অন্তর্গামী পানিপ্রবাহের সাথে দেহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পরিবাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন স্থানের গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ক্ষণপদীয় কোষে গৃহীত হয় এবং **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** ঘটায়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ এবং বিপাকজাত বর্জ্যপদার্থ সিলেন্টেরনের বহির্গামী পানি প্রবাহের সাথে মুখছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়। অর্থাৎ, সিলেন্টেরন একদিকে খাদ্য পরিপাকে এবং অন্যদিকে খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবহনে সাহায্য করে। তাই সিলেন্টেরনকে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা পরিপাক-সংবহন গহ্বর** বলা হয়। কর্ষিকায় সিলেন্টেরন প্রসারিত থাকে বলে এগুলো ফাঁপা হয়। সিলেন্টেরনকে অনেকসময় **ব্লাইন্ড গাট** (blind gut) বা **ব্লাইন্ড স্যাক** (blind sac)-ও বলে। কারণ দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি মাত্র ছিদ্র, অর্থাৎ মুখছিদ্রের মাধ্যমে এটি খাদ্যগ্রহণ ও বর্জ্য ত্যাগ করে।

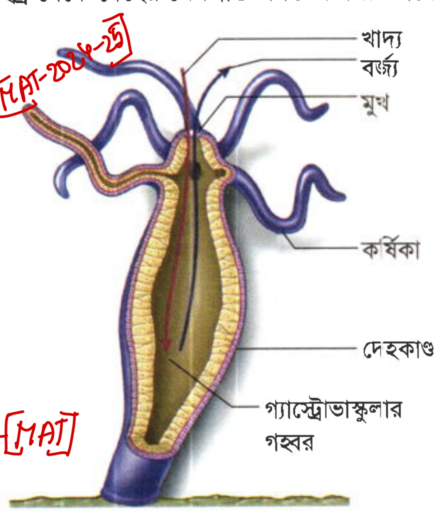

চিত্র ২.১.১৭ : গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর

সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	**সিলোম**	**সিলেন্টেরন**
১. অবস্থান	ত্রিস্তরী প্রাণিদের দেহপ্রাচীরের ভিতরের দিক ও পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান।	দ্বিস্তরী প্রাণিদের দেহের মাঝখানে অবস্থিত প্রশস্ত ফাঁকা স্থান বিশেষ।
২. আবরণী	ভিতর ও বাইরে উভয় দিকে মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম পর্দায় আবৃত।	সবদিক দিয়ে গ্যাস্ট্রোডার্মিসে আবৃত।
৩. উৎপত্তি	মেসোডার্মজাত ও সিলোমিক থলি থেকে উদ্ভূত।	এন্ডোডার্মজাত এবং আর্কেন্টেরন থেকে উদ্ভূত।
৪. অন্তঃস্থ অঙ্গাদি	বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-হৃৎপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদি এতে অবস্থান করে।	এতে কোন অঙ্গ অবস্থান করেনা।
৫. ধারণকৃত পদার্থ	সিলোমিক তরলে পূর্ণ থাকে।	পানি, খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থে পূর্ণ থাকে।
৬. কাজ	শুধু দেহগহ্বরের কাজ করে।	দেহগহ্বর ও পরিপাক গহ্বরের কাজ করে।

এক নজরে *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষসমূহের অবস্থান, গঠন ও কাজ			
কোষের নাম	অবস্থান	গঠন	কাজ
১. পেশি-আবরণী কোষ	এপিডার্মিসের সমস্ত অংশ জুড়ে।	দুটি কার্যকর অংশ নিয়ে গঠিত– **গ্রন্থিময়** এপিথেলিয়াল অংশ এবং **মায়োনিমসহ** অংশ। মায়োনিম অংশগুলো পরস্পর সংযুক্ত।	১. গ্রন্থিময় অংশ আবরণ সৃষ্টি করে এবং কিউটিকল তৈরি করে। ২. অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তর চলনে সাহায্য করে।
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ	কোষের মধ্যবর্তী স্থানে।	সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য অঙ্গাণুসহ গোল, ডিম্বাকার বা কোণাকার ক্ষুদ্র কোষ।	প্রয়োজনে এপিডার্মিসের যে কোনো কোষে রূপান্তরিত হতে পারে।
৩. নিডোব্লাস্ট	কর্ষিকা ও দেহপ্রাচীরের অন্যান্য কোষের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে।	কোষের অভ্যন্তরে ক্যাপসুল থাকে বলে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস পরিধির দিকে অবস্থান করে। ক্যাপসুলের ভিতরে প্যাঁচানো সূত্রক ও বিষাক্ত **হিপনোটক্সিন** থাকে। কোষের মুক্ত প্রান্তে সংবেদী **নিডোসিল** এবং সূত্রকের গোড়ায় **বার্ব** ও **বার্বিওল** থাকে।	১. আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২. খাদ্য গ্রহণ ও চলনে সাহায্য করে।
৪. সংবেদী কোষ	এপিডার্মিসের অন্যান্য কোষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো।	মুক্ত প্রান্ত সংবেদী রোমযুক্ত। রোমের মাধ্যমে স্নায়ুতন্তুর সাথে সংযুক্ত।	যে কোনো উদ্দীপনা গ্রহণ করে স্নায়ু-তন্তুকে পৌঁছে দেয়।
৫. স্নায়ু কোষ	মেসোগ্লিয়ার মধ্যে।	স্নায়ু কোষের তন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে **স্নায়ু জালিকা** গঠন করে।	১. সংবেদী কোষ কর্তৃক গৃহীত সংবেদন দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠানো। ২. বিভিন্ন কোষের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অন্যান্য কোষের কাজ নিয়ন্ত্রণ।
৬. গ্রন্থি কোষ	মুখ ছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতি অঞ্চলে।	অনেকটা স্তম্ভাকার; এগুলো রূপান্তরিত পেশি-আবরণী কোষ।	১. মিউকাস নামক আঠালো রস ক্ষরণ করে। ২. পাদ-চাকতির গ্রন্থি কোষ গ্যাসের বুদবুদ ও ক্ষণপদ বিস্তারে সক্ষম।
৭. জনন কোষ	জনন অঙ্গে।	ডিম্বাকার ও কিছু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত রূপান্তরিত ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ।	যৌন জনন সম্পন্ন করে।

এক নজরে *Hydra*-র গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষসমূহের অবস্থান, গঠন ও কাজ			
কোষের নাম	অবস্থান	গঠন	কাজ
১. পুষ্টি কোষ	গ্যাস্ট্রোডার্মিসের অধিকাংশ অংশ জুড়ে।	মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন স্থানে মায়োনিম থাকে। কিছু ক্ষণপদযুক্ত ও কিছু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত।	১. ক্ষণপদযুক্ত কোষ খাদ্য বস্তু অন্তঃকোষীয়ভাবে পরিপাক করে। ২. ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ পানির স্রোত সৃষ্টি করে।
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ	দুটি পুষ্টি কোষের মধ্যবর্তী স্থানে।	ত্রিকোণা, গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং কোষে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে।	প্রয়োজনে গ্যাস্ট্রোডার্মিসের যে কোনো কোষে রূপান্তরিত হতে পারে।
৩. গ্রন্থি কোষ	বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টি কোষের মধ্যবর্তী স্থানে।	এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণকারী গ্রন্থি কোষ।	১. নিঃসৃত এনজাইম বহিঃকোষীয় পরিপাকে সাহায্য করে। ২. আঠালো মিউকাস নিঃসৃত করে।
৪. সংবেদী কোষ	গ্যাস্ট্রোডার্মিসের অন্যান্য কোষের মাঝে।	লম্বা ও সরু কোষ। মুক্ত প্রান্তে সংবেদী রোম থাকে।	উদ্দীপনা বিশেষ করে সিলেন্টেরনে খাদ্যের উপস্থিতি গ্রহণ করে।
৫. স্নায়ু কোষ	মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত।	অনিয়ত আকারবিশিষ্ট। কোষ দেহ ও সূক্ষ্ম তন্তু নিয়ে স্নায়ুজালিকা গঠন করে।	সংবেদী কোষ কর্তৃক গৃহীত উদ্দীপনার উপযুক্ত সাড়া দেয়।

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া (Feeding and Digestion of *Hydra*)

পুষ্টি (Nutrition) : যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী নিজ পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জটিল জৈব খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় কোষে পরিবহন ও শোষণ উপযোগী সরল ও দ্রবণীয় খাদ্যে পরিণত করে পরিপাককৃত খাদ্যসার শোষণের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহ থেকে বের করে দেয় তাকে পুষ্টি বলে।

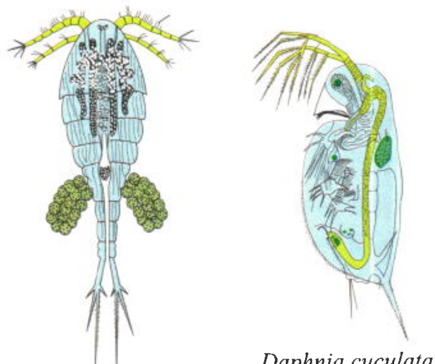

চিত্র ২.১.১৮ : *Hydra*--র প্রধান খাদ্য

Hydra-র খাদ্য : *Hydra* মাংসাশী (carnivorous) প্রাণী। যে সব ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়, সে সব প্রাণী *Hydra*-র প্রধান খাদ্য। *Hydra*-র খাদ্য তালিকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা, *Cyclops* (সাইক্লপস) ও *Daphnia* (ড্যাফনিয়া) নামক ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী (arthropods), ছোট ছোট কৃমি, খণ্ডকায়িত প্রাণী (annelids) ও মাছের ডিম। তবে প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী। সাধারণত প্রাণীর টিস্যুরসে **গ্লুটাথিওন** (glutathione) নামক একধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা অন্য প্রাণীকে শিকারে প্রলুব্ধ করে। *Hydra* কেবল সেসব প্রাণীকে শিকার করে যাদের টিস্যুরসে **গ্লুটাথিওন** (glutathione) থাকে।

শিকার ধরার কৌশল : ক্ষুধার্ত *Hydra* পদতলকে ভিত্তির সাথে আটকে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্যপ্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

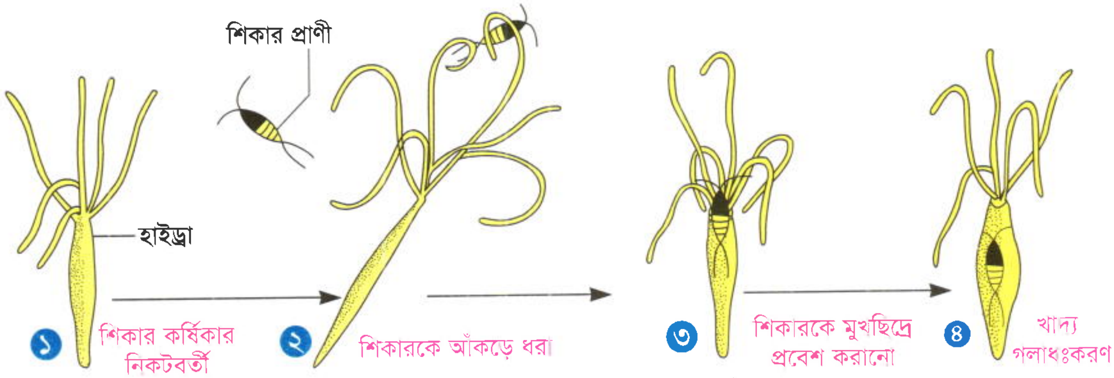

চিত্র ২.১.১৯ : *Hydra*-র শিকার ধরার কৌশল

ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট-সূত্রক শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে এবং **গ্লুটিন্যান্ট**গুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে। **স্টিনোটিল** ধরনের নেমাটোসিস্ট **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক স্নায়ু অবসকারী বিষ (neurotoxin) শিকারের দেহে প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয়। এরপর কর্ষিকা সেটিকে পেঁচিয়ে মুখের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌঁছে।

খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Digestion) : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অণুতে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। *Hydra*-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃত্বকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। **পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:**

[MAT- 2024-25]

১। **বহিঃকোষীয় পরিপাক (Extracellular Digestion) :** কোষের বাইরে অর্থাৎ সিলেন্টেরনে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা **আন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে। খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃত্বকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাচীরের প্রবল সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের **ফ্ল্যাজেলা** সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত করে। গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে থাকে। পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে **পলিপেপটাইড**-এ পরিণত করে, তবে লিপিড ও শর্করা খাদ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না।

২. **অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular Digestion) :** দেহের সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীর ক্ষণপদীয় কোষগুলো **ক্ষণপদ** বের করে কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃকরণ করে, ফলে কোষের ভিতর **খাদ্যগহ্বর** গঠিত হয়। খাদ্যকণা তখন কোষের ভিতর খাদ্যগহ্বরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এসিড ক্ষরিত হয়ে খাদ্যকে আম্লিক করে। পরে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি হলে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। **ট্রিপসিন** আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামিনো এসিডে, **লাইপেজ** স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং **অ্যামাইলেজ** শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। খাদ্যগহ্বরে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। *Hydra* আমিষ, স্নেহ ও কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারলেও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না। পরিপাকের এ পর্যায়টি কোষের ভিতরে ঘটে বলে একে **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে।

বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাকের পার্থক্য

বিষয়	বহিঃকোষীয় পরিপাক	অন্তঃকোষীয় পরিপাক
১. সম্পাদনের স্থান	কোনো কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত না হয়ে দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো গহ্বর বা থলির ভিতর সংঘটিত হয়।	নির্দিষ্ট কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়।
২. খাদ্য গ্রহণ	সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গের সাহায্যে নির্দিষ্ট পথে খাদ্য গৃহীত হয়।	ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্য গৃহীত হয়।
৩. গৃহীত খাদ্যের অবস্থান	খাদ্য পৌষ্টিকনালি (পাকস্থলি, অন্ত্র) বা সিলেন্টেরনে অবস্থান করে।	গৃহীত খাদ্য খাদ্য গহ্বরের ভিতর অবস্থান করে।
৪. এনজাইম	ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়।	পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ঐ কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত হয়।
৫. শোষণ ও পরিবহন	খাদ্যবস্তু সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার পর বিভিন্ন কোষে শোষিত হয়।	খাদ্য গহ্বরের পার্শ্ববর্তী সাইটোপ্লাজমই খাদ্যের সারবস্তু শোষণ করে, কোনো পরিবহন ঘটেনা।
৬. বর্জ্য নিষ্কাশন	খাদ্যের অপাচ্য অংশ নির্দিষ্ট নালিপথে নিক্ষিপ্ত হয়।	খাদ্যের অপাচ্য বর্জ্য টিস্যুরসে নিক্ষিপ্ত হয়।

পরিশোষণ, আত্মীকরণ ও বর্জন : খাদ্যের পরিপাককৃত সারাংশ সাইটোপ্লাজমে পরিশোষিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহপ্রাচীরের সঙ্কোচন-প্রসারণ ও ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনের ফলে মুখছিদ্র দিয়ে বহির্গামী পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বর্জিত হয়।

Hydra-র চলন (Locomotion of *Hydra*)

খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, উদ্দীপনায় সাড়া দেয়া, প্রজনন ইত্যাদি প্রয়োজনে প্রাণীরা যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে **চলন** বলে।

Hydra অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত বস্তুর সাথে পাদ-চাকতি দিয়ে লেগে থাকলেও খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা, জনন, স্পর্শ, ইত্যাদি উদ্দীপনার কারণে স্থানান্তরিত হয়। চলনের জন্য *Hydra*-র সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ নেই। চলন মূলত এপিডার্মিসের পেশি-আবরণী কোষ এবং গ্যাস্ট্রোডার্মিসের পুষ্টি কোষের পেশি লেজের বা পেশি প্রবর্ধকের মায়োনিমের সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। তবে কর্ষিকা, নেমাটোসিস্ট, গ্রন্থিকোষ ও পাদ-চাকতি চলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কোনো কারণে *Hydra* উদ্দীপ্ত হলে সেই উত্তেজনা সংবেদী কোষে গৃহীত হয়ে স্নায়ু কোষে পৌঁছে। স্নায়ু কোষের স্নায়ুসূত্র পথে এ উদ্দীপনা পেশি-আবরণী কোষের পেশি লেজের মায়োনিমে পৌঁছালে এটি সঙ্কুচিত হয় ফলে *Hydra*-র দেহ খাটো ও মোটা হয়। অন্যদিকে পুষ্টি কোষের পেশি লেজের মায়োনিমে উদ্দীপনা পৌঁছালে তা বৃত্তাকার পেশির মতো কাজ করে অর্থাৎ এর সঙ্কোচনে দেহ লম্বা ও সরু হয়। দেহের একপাশের পেশি-আবরণী কোষের সঙ্কোচন এবং অন্য পাশের পেশি-আবরণী কোষের প্রসারণের ফলে *Hydra* দেহকে যে কোনো দিকে বাঁকাতে পারে।

Hydra-তে বিভিন্ন ধরনের চলন পদ্ধতি দেখা যায়। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. লুপিং (Looping) বা হামাগুড়ি : **লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য *Hydra* সাধারণত লুপিং চলনের আশ্রয় নেয়।** এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশের পেশি-আবরণী কোষগুলো সঙ্কুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে *Hydra* গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে ও বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর পাদ-চাকতিকে মুক্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা বিযুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এ পদ্ধতির পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* স্থান ত্যাগ করে। জোঁক বা শুঁয়াপোকা চলার সময় যেভাবে ক্রমান্বয়িক লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি হয় হাইড্রার এ চলনও দেখতে অনেকটা একই রকম হওয়ায় লুপিং চলনকে **জোঁকা চলন বা শুঁয়াপোকা চলন** নামেও অভিহিত করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রতিবার চলনে একটি লুপ তৈরি হয় এবং *Hydra* তার দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে।

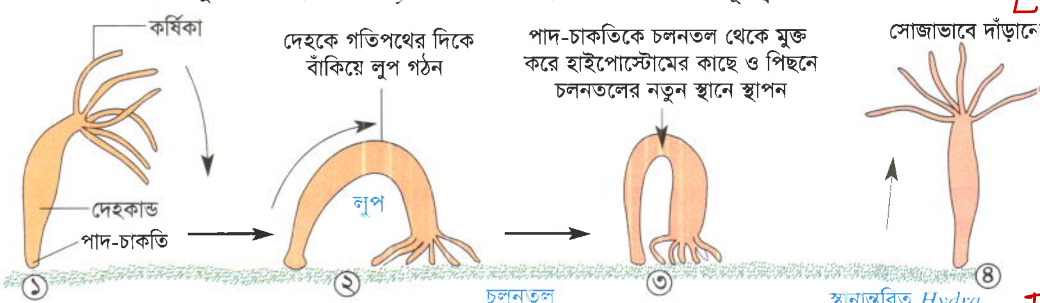

চিত্র ২.১.২০ : *Hydra*-র লুপিং প্রক্রিয়ায় চলনের বিভিন্ন ধাপ

২. সমারসল্টিং (Somersaulting) বা ডিগবাজী : **এটি *Hydra*-র সাধারণ ও দ্রুত চলন প্রক্রিয়া। স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য *Hydra* সাধারণত এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।** চলনের শুরুতে *Hydra* দেহকে বাঁকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকাস্থিত গ্লুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে, ফলে একটি **লুপ** বা **ফাঁস** তৈরি হয়। পরে পাদ-চাকতি বিমুক্ত করে কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয় এবং পুনরায় দেহকে বাঁকিয়ে পাদ-চাকতির সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে, ফলে আরেকটি লুপ তৈরি হয়। এরপর কর্ষিকা মুক্ত করে পাদ-চাকতির উপর ভর করে দেহকে সোজা করে দেয়। বার বার এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এরূপ চলনে *Hydra* একবার কর্ষিকার উপর এবং একবার পাদ-চাকতির উপর ভর করে দাঁড়ায় যা

পর্যায়ক্রমে চলে, তাই একে **ডিগবাজী চলন** বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবার চলনে দুটি লুপ তৈরি হয় এবং *Hydra* তার দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

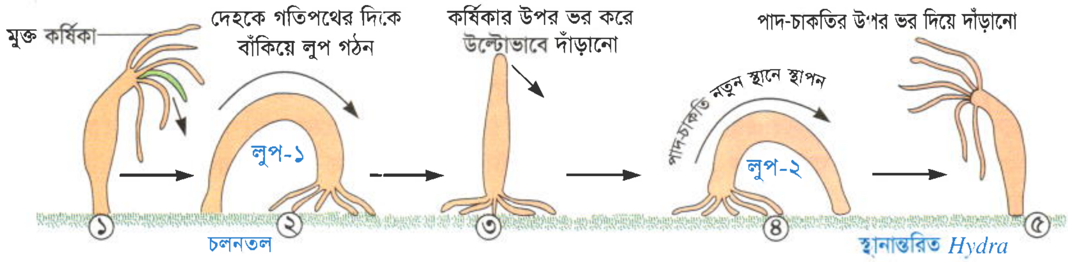

চিত্র ২.১.২১ : *Hydra*-র সমারসল্টিং প্রক্রিয়ায় চলনের বিভিন্ন ধাপ

৩. গ্লাইডিং (Gliding) বা অ্যামিবয়েড চলন : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* পদতলের বহিঃত্বকীয় কোষগুলো থেকে পিচ্ছিল রস ক্ষরণ করে। পরে ঐ স্থান থেকেই প্রক্ষিপ্ত কোষীয় ক্ষণপদের অ্যামিবয়েড চলনের সাহায্যে দেহটি অত্যন্ত ধীরগতিতে মসৃণতলে খুব সামান্য দূরত্বে স্থানান্তরিত হয়।

৪. ভাসা (Floating) : মাঝে মাঝে *Hydra* পাদ-চাকতির বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় **বুদবুদ** সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত, হালকা ও উপুড় হয়ে পানির পৃষ্ঠতলে ভেসে উঠে। এখানে বুদবুদ ফেটে মিউকাস ভেলার মতো ছড়িয়ে গেলে *Hydra* নিম্নমুখী হয়ে ভেসে থাকে। এভাবে প্রাণী ঢেউয়ের ধাক্কায় কিছুদূর ভেসেও যেতে পারে।

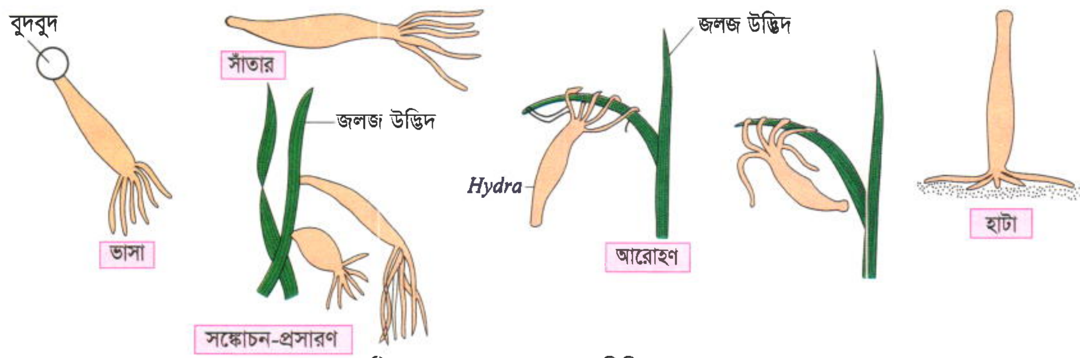

চিত্র ২.১.২২ : *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের চলন

৫. সাঁতার (Swimming) : কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি থেকে মুক্ত করে *Hydra* সহজেই দেহকে আন্দোলিত করে সাঁতার কাটতে পারে।

৬. হেঁচরান (Crawling) : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে। পরে পাদ-চাকতি মুক্ত ও কর্ষিকা সঙ্কুচিত করে পাদ-চাকতিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় *Hydra*-র **আরোহণ** ও **অবরোহণ** সম্পন্ন হয়।

৭. হাঁটা (Walking) : এ ক্ষেত্রে *Hydra* তার দেহের ভার পাদ-চাকতির উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীর গতিতে চলতে পারে।

৮. দেহের সঙ্কোচন- প্রসারণ (Body Contraction and Expansion) : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* দেহকে মুক্ত করে দেহপ্রাচীরের পেশি-আবরণী কোষের সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের আকার দ্রুত খাটো ও লম্বা করে, ফলে এক ধরনের চলনের সৃষ্টি হয়।

৯. ডুবা (Drowing) : ভাসার সময় তৈরি হওয়া বুদবুদ মিলিয়ে গেলে *Hydra*-র দেহ ভারী হয়ে দ্রুত পানির নিচের দিকে চলে যায় অর্থাৎ ডুবে যায়। এটি *Hydra*-র এক ধরনের অনিচ্ছাকৃত চলন।

লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের মধ্যে পার্থক্য	
লুপিং/ হামাগুড়ি চলন	সমারসল্টিং/ডিগবাজী চলন
১. *Hydra*-র বিশেষ চলন পদ্ধতি।	১. *Hydra*-র সাধারণ চলন পদ্ধতি।
২. মন্থর গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া।	২. দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া।
৩. এ প্রক্রিয়ায় পাদ-চাকতি কখনো মাটির উপরে উঠে আসে না।	৩. এ প্রক্রিয়ায় পাদ-চাকতি মাটির উপরে উঠে আসে।
৪. এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* কখনো কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় না।	৪. এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* একবার কর্ষিকা এবং একবার পাদ-চাকতির উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়।
৫. কর্ষিকা সর্বদা গতিপথের দিকে থাকে।	৫. একবার কর্ষিকা এবং আরেকবার পাদ-চাকতি গতিপথের দিকে থাকে।
৬. একবার চলতে একটিমাত্র লুপ তৈরি হয়।	৬. একবার চলতে দুটি লুপ তৈরি হয়।
৭. এ পদ্ধতিতে একবার চলতে *Hydra* তার দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে।	৭. এ পদ্ধতিতে একবার চলনে *Hydra* তার দেহের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।
৮. লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়।	৮. অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

Hydra-র শ্বসন (Respiration)

Hydra-র নির্দিষ্ট কোন শ্বসন অঙ্গ নেই। তবে নিচে বর্ণিত দুই উপায়ে গ্যাসীয় বিনিময় সংঘটিত হয়:

১. **এপিডার্মিসের মাধ্যমে :** চারপাশের পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন সমগ্র বহিঃদেহতলের এপিডার্মাল কোষের মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। শ্বসন শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি একইভাবে বহির্গত হয়।

২. **গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাধ্যমে :** গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলার আন্দোলনের ফলে মুখছিদ্র পথে সৃষ্ট অবিরাম পানি প্রবাহের জন্য গ্যাস্ট্রোডার্মিস সব সময়ই পানির সংস্পর্শে থাকে। তখন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানি ও গ্যাস্ট্রোডার্মাল কোষে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির সাথে নির্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হয়।

Hydra-র রেচন (Excretion)

Hydra-র নির্দিষ্ট কোন রেচন অঙ্গ নেই। কোষ বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ বর্জ্যপদার্থ (প্রধানতঃ অ্যামোনিয়া) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ থেকে চারপাশের পানিতে মুক্ত হয়।

Hydra-র উত্তেজিতা (Irritability)

তরিৎ উত্তেজিতা প্রকাশ করা প্রাণিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিচে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে *Hydra*-র উত্তেজিতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

১. **স্পর্শ :** ভাসমান *Hydra* যখন কোনো অবলম্বন, যেমন–পাতা, জলজ উদ্ভিদ, অগভীর জলাশয়ের তলদেশ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে তখন পাদ-চাকতির মাধ্যমে ঐসব বস্তুর সাথে আটকে যায়। আবার সূঁচ দিয়ে *Hydra*-কে খোঁচা দিলে এর দেহের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ দেহ সঙ্কুচিত হয়।

২. **আলো:** অত্যধিক আলো বা অন্ধকার কোনোটাই *Hydra*-র পছন্দ নয়। তাই জলাশয়ের যে স্থানে পরিমিত (স্তিমিত) আলো থাকে সেখানে প্রচুর *Hydra* পাওয়া যায়।

৩. **তাপমাত্রা :** *Hydra* সব সময় ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা-বিশিষ্ট শীতল পানি পছন্দ করে। তাই যখন কোনো জলাশয়ের উপরিভাগের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তখন *Hydra* ধীরে ধীরে নিচের দিকে যেতে থাকে।

৪. **ক্ষুধা:** সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি *Hydra* এর দেহ ও কর্ষিকাগুলোর সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। পেট ভরা অবস্থায় এ ক্রিয়াটি মন্থর গতিতে চলে। কিন্তু ক্ষুধার্ত *Hydra* খাদ্যান্বেষণের জন্য খুব দ্রুত গতিতে বিভিন্ন দিকে এর দেহকে সঞ্চালিত করে থাকে।

৫. **বিদ্যুৎ প্রবাহ :** অবিরাম দুর্বল বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকলে *Hydra* দেহকে অ্যানোডের প্রতি বাঁকিয়ে দেয় এবং পরে সম্পূর্ণ দেহকে সঙ্কুচিত করে ফেলে।

Hydra-র স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System of *Hydra*)

নিম্নশ্রেণির প্রাণিদের মধ্যে দূর্বল প্রকৃতির স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ *Hydra* তথা নিডারিয়ান প্রাণীতে প্রথম দেখা যায়। এদের অনিয়তাকার স্নায়ু কোষ থেকে স্নায়ু তন্তু বেরিয়ে **স্নায়ু জালক** গঠন করে। এদের স্নায়ু তন্তুগুলো অ্যাক্সন বা ডেনড্রাইটের মতো নয় এবং এগুলো কোনো **সাইনাপস** গঠন করে না।

মেসোগ্লিয়ার উভয় পাশে একটি করে স্নায়ু জালক অবস্থিত। একটি স্নায়ু জালক এপিডার্মিস এবং অন্যটি গ্যাস্ট্রোডার্মিসের সাথে যুক্ত থাকে। মুখছিদ্র ও পাদ-চাকতি অঞ্চলে স্নায়ু জালক ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে। দুটি স্নায়ু জালক পরস্পরের সাথে এবং সংবেদী ও পেশি-আবরণী কোষের সাথে সংযুক্ত থাকে। সংবেদী কোষগুলো পরিবেশ থেকে স্পর্শ, আলোক ও রাসায়নিক সংবেদ গ্রহণ করে স্নায়ু জালকের মাধ্যমে পেশি-আবরণী কোষে প্রেরণ করে।

চিত্র ২.১.২৩ : *Hydra*-র দেহে স্নায়ু জালক

Hydra-র জনন (Reproduction of *Hydra*)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশধর রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় জীব দেহাংশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে (অযৌন) বা একই প্রজাতির অন্য সদস্যের সহযোগিতায় ও গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (যৌন) নিজ আকৃতিসদৃশ বংশধর সৃষ্টি করে। *Hydra* **অযৌন ও যৌন** উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে। [MAT– 2015-16]

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে অযৌন জনন বলে। এ ধরনের জনন পদ্ধতিতে একটি মাত্র মাতৃ *Hydra* সদস্য থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। *Hydra* দুভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, যথা– **মুকুলোদগম** ও **বিভাজন**। নিচে এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

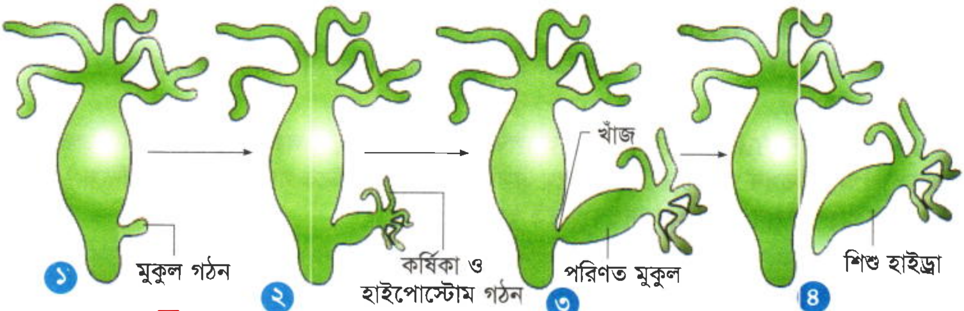

[MAT- 2014-15]

চিত্র ২.১.২৪ : *Hydra*-র মুকুলোদগমের ধাপসমূহ

১. মুকুলোদগম (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বছরের সব ঋতুতেই বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকায় এটি বেশি ঘটে। নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি ধাপে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

i. প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোনো স্থানের এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভক্ত হয়ে একটি ক্ষুদ্র **স্ফীত** অংশের সৃষ্টি করে।

ii. স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার **মুকুল** (bud)-এ পরিণত হয়। এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস সৃষ্টি হয়।

iii. মাতৃ হাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয়।

iv. মুকুলটি মাতৃ হাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বড় হয় এবং শীর্ষপ্রান্তে গঠিত হয় মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা।

v. এপর্যায়ে মাতৃ হাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজের সৃষ্টি হয়। খাঁজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃ হাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

vi. অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

vii. শিশু হাইড্রা কিছুক্ষণ বিচরণের পর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

ঘটনাক্রমে একটি *Hydra*-য় বেশ কয়েকটি মুকুলের সৃষ্টি হতে পারে। এসব মুকুল আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি করতে পারে। সম্পূর্ণ মাতৃ *Hydra*-কে তখন একটি দলবদ্ধ প্রাণীর মতো দেখায়। মুকুল সৃষ্টি এবং মাতৃ *Hydra* থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রায় ৪ থেকে ৭ দিন সময় লাগে। (নতুন তথ্য)

২) **বিভাজন (Fission) :** বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া নয় কারণ এটি দৈবাৎ সংঘটিত হয়। কোন বাহ্যিক কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা জন্মায়। একে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় দেহের হারানো বা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানী **ট্রেম্বলে** (Trembley) ১৭৪৪ সালে সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অতিদ্রুত বিভক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে। এসব কোষ দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ গঠনের মাধ্যমে অপত্য হাইড্রার বিকাশ ঘটে। সুতরাং **হাইড্রার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই**। বিভাজন দুভাবে হতে পারে, যথা-**অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন** ও **অনুপ্রস্থ বিভাজন**।

i. **অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন :** হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয়।

ii. **অনুপ্রস্থ বিভাজন :** কোনো কারণে হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

যে পদ্ধতিতে জীব হ্যাপ্লয়েড (n সংখ্যক) **জননকোষ, যথা-শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠন ও তাদের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড** (2n) **জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমে অপত্য বংশের সৃষ্টি করে তাকে যৌন প্রজনন বলে।**

যৌন প্রজনন সাধারণত শীতকালে ঘটে। অধিকাংশ হাইড্রা **একলিঙ্গ** (dioecious) অর্থাৎ শুক্রাশয় (পুংজননাঙ্গ) ও ডিম্বাশয় (স্ত্রীজননাঙ্গ) ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হয়। তবে কিছু প্রজাতি **উভলিঙ্গ** (monoecious) অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই দেহে গঠিত হয়। একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই **পরনিষেক** প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে। কারণ উভয় প্রকার জনন কোষ (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) একই সময়ে পরিণত হয় না। এক হাইড্রার ডিম্বাণু অপর হাইড্রার শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে একে **পরনিষেক** বলে। তাই অনেক প্রজাতি উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের জননকোষগুলো একই সময়ে পরিণত হয় না বলে **হাইড্রায় স্বনিষেক ঘটে না**। হাইড্রার দেহে স্থায়ী জননাঙ্গ থাকে না। এপিডার্মিসের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত ও রূপান্তরিত হয়ে জননাঙ্গ ও জননকোষ গঠন করে। সম্পূর্ণ প্রজনন প্রক্রিয়াটি নিচেবর্ণিত তিনটি ধাপে ঘটে, যথা–

১. **জননকোষ গঠন** বা **গ্যামেটোজেনেসিস**, ২. **নিষেক** এবং ৩. **পরিস্ফুটন**। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো–

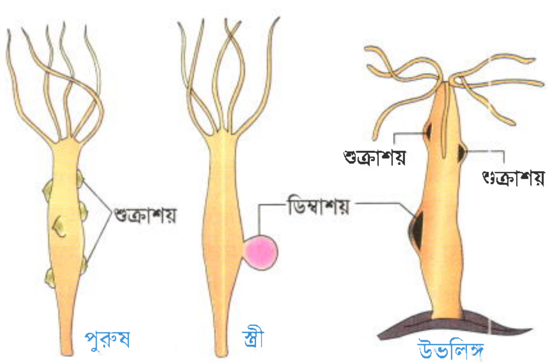

চিত্র ২.১.২৫ : হাইড্রার জনন অঙ্গ

১. গ্যামেটোজেনেসিস : যে প্রক্রিয়ায় ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ রূপান্তরিত ও বিভাজিত হয়ে জননকোষ গঠন করে তাকে **গ্যামেটোজেনেসিস** বলে। গ্যামেটোজেনেসিস দুভাগে বিভক্ত, যথা– **স্পার্মাটোজেনেসিস** ও **উওজেনেসিস**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শুক্রাশয়ের উৎপত্তি ও স্পার্মাটোজেনেসিস : প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অর্ধাংশে ও হাইপোস্টোমের কাছাকাছি স্থানের এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে এক বা একাধিক মোচাকার **শুক্রাশয়** (testis) সৃষ্টি হয়। এর শীর্ষে একটি বোঁটা বা **নিপল** (nipple) এবং পরিণত শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য **শুক্রাণু**। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis) বা **শুক্রাণুজনন** বলে। শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ **শুক্রাণু মাতৃকোষ** (sperm mother cell) হিসেবে কাজ করে। কোষগুলো বারংবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia) সৃষ্টি করে। পরে এগুলো বৃদ্ধিলাভ করে **স্পার্মাটোসাইট** (spermatocyte)-এ পরিণত হয়। প্রত্যেক স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপ্লয়েড (n) **স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে। প্রত্যেক স্পার্মাটিড একেকটি **শুক্রাণু** (sperm)–তে পরিণত হয়। প্রত্যেক পরিণত শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক** (head), সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** (middle piece) এবং একটি লম্বা, সরু, বিচলনক্ষম **লেজ** (tail) নিয়ে গঠিত।

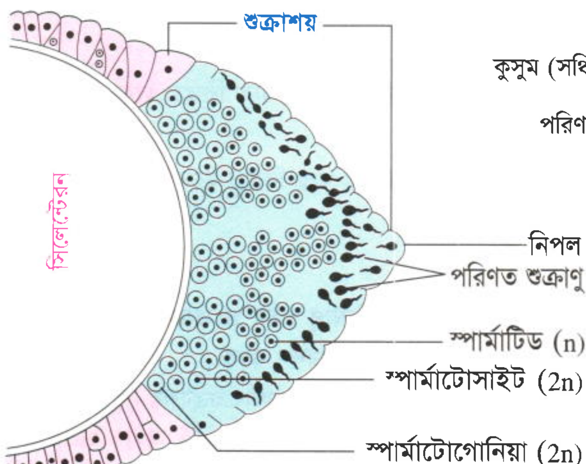

চিত্র ২.১.২৬ : শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টি

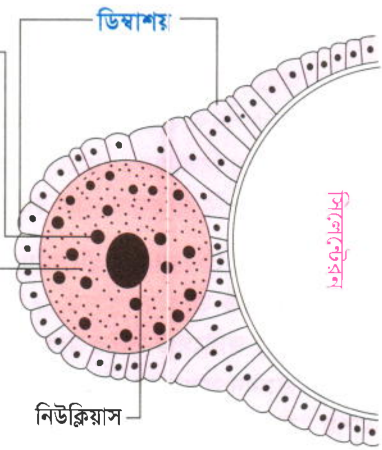

চিত্র ২.১.২৭ : ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্টি

খ. ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি ও উওজেনেসিস : প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের অর্ধাংশে, কিন্তু পদতলের সামান্য উপরে এপিডার্মিসের একটি বা দুটি স্থানের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের বারংবার বিভাজনের ফলে সাধারণত একটি বা দুটি গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovary) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে একটি করে **ডিম্বাণু** (ovam) সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **উওজেনেসিস** (oogenesis) বা **ডিম্বাণুজনন** বলে। ডিম্বাশয়ে অবস্থিত কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ **ডিম্বাণু মাতৃকোষ** (egg mother cell) হিসেবে কাজ করে। কোষগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia) গঠন করে। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রস্থ একটি কোষ বড় হয়ে **উওসাইট** (oocyte)-এ পরিণত হয় এবং ছোট কোষগুলোকে গলাধঃকরণ করে। এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে ৩টি ক্ষুদ্র **পোলার বডি** (polar body) ও ১টি বড় সক্রিয় **উওটিড** (ootid) সৃষ্টি করে। উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে **ডিম্বাণু**তে পরিণত হয়। পোলার বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডিম্বাণুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে ডিম্বাশয়ের বহিরাবরণ ছিঁড়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর চারদিকে তখন জিলেটিনের পিচ্ছিল আস্তরণ থাকে।

২) নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু পরিণত হলে শুক্রাশয়ের নিপল বিদীর্ণ করে শুক্রাণুগুলো ডিম্বাণুর সন্ধানে পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতরাতে থাকে। ২৪ - ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উন্মুক্ত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণুও নষ্ট হয়ে ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। শুক্রাণুর ঝাঁক একেকটি ডিম্বাণুর চারদিক ঘিরে ফেলে। একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটি মাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে **নিষেক** সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড (2n) **জাইগোট** (zygote) গঠন করে।

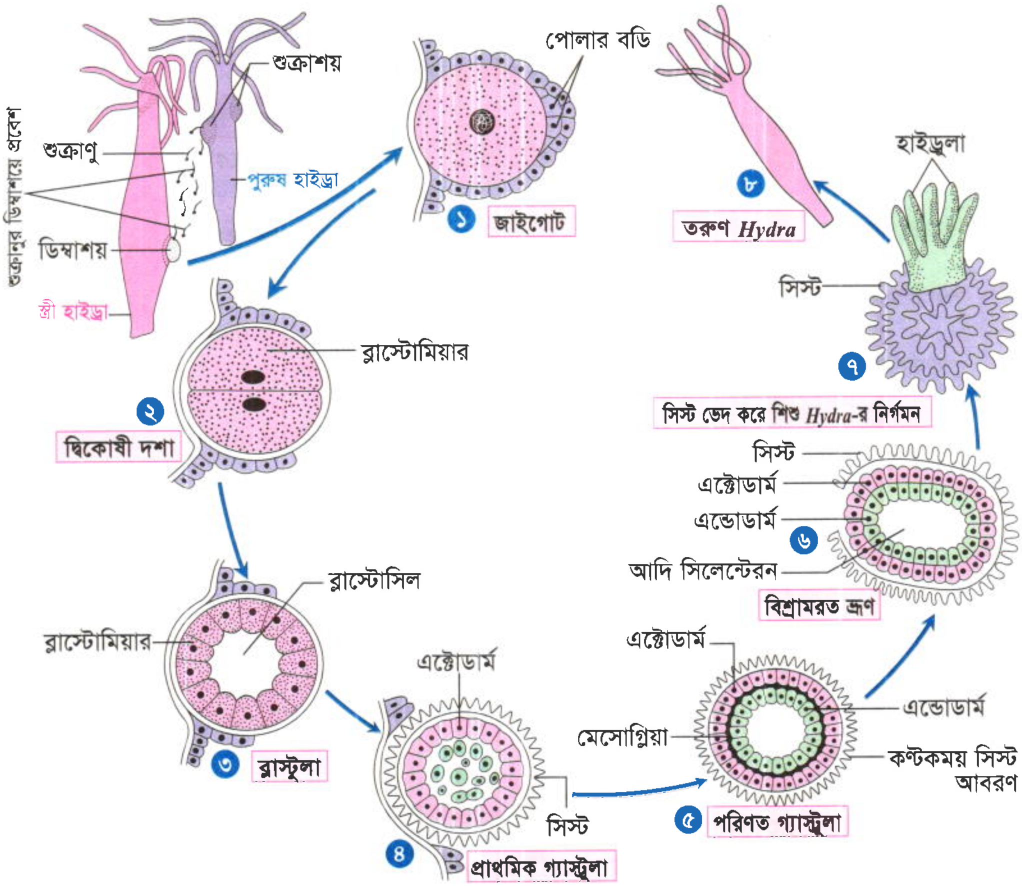

চিত্র ২.১.২৮ : *Hydra*-র নিষেক ও পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

৩. পরিস্ফুটন (Development) : যেসব ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। জাইগোট নানা ধরনের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়।

হাইড্রার পরিস্ফুটনকালে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ দেখা যায়।

ক মরুলা (Morula) : জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারংবার বিভক্ত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা**।

খ ব্লাস্টুলা (Blastula) : শীঘ্রই মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোল ভ্রূণে পরিণত হয়। এর নাম **ব্লাস্টুলা**। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) এবং কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে।

গ. **গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula) :** ব্লাস্টুলা **গ্যাস্ট্রুলেশন** (gastrulation) প্রক্রিয়ায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। মাতৃদেহের সাথে সংযুক্ত এ গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** (stereogastrula) বলে।

ঘ. **সিস্ট (Cyst) :** এক্টোডার্মের কোষ থেকে নিঃসৃত একপ্রকার পদার্থ গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে একটি **কাইটিন** নির্মিত কাঁটাযুক্ত **সিস্ট** আবরণী গঠন করে। সিস্টবদ্ধ ভ্রূণটি মাতৃ হাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির তলদেশে চলে যায়।

ঙ. **হাইড্রুলা (Hydrula) :** বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং এর অগ্রপ্রান্তে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র ও কর্ষিকা এবং পশ্চাৎপ্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়। ভ্রূণের এ দশাকে **হাইড্রুলা** বলে। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী বিদীর্ণ করে পানিতে বেরিয়ে আসে এবং স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

Hydra-র যৌন জনন ও পরিস্ফুটনের প্রবাহচিত্র

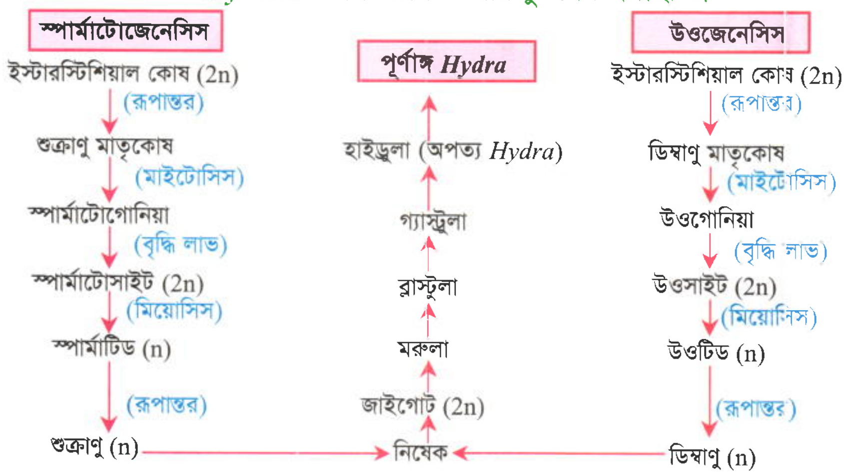

Hydra-র পুনরুৎপত্তি (Regeneration)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণী হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশকে দেহে পুনর্গঠন করে তাকে পুনরুৎপত্তি (regeneration) **বলে**। *Hydra*-র ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। **আব্রাহাম ট্রেমলে** (Abraham Trembley, 1744) প্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো *Hydra*-কে যদি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই এর হারানো অংশকে পুনরুৎপাদন করে নতুন *Hydra* সৃষ্টি করে। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ **মৌখিক প্রান্ত** (oral end) থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং **বিমৌখিক প্রান্ত** (aboral end) থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

একটি *Hydra*-র মাথা অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুভাগে ভাগ করলে দুই মাথাওয়ালা *Hydra*-র আবির্ভাব ঘটে।

Hydra-র এ ধরনের স্বভাবের জন্য রূপকথার দানব **হাইড্রা**-র নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এ দানবের নয়টি মাথা ছিল। রূপকথা অনুযায়ী **হারকিউলিস** (Hercules) নামক এক শক্তিধর মানব এ দানবের একটি মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দুটি মাথা গজাতো।

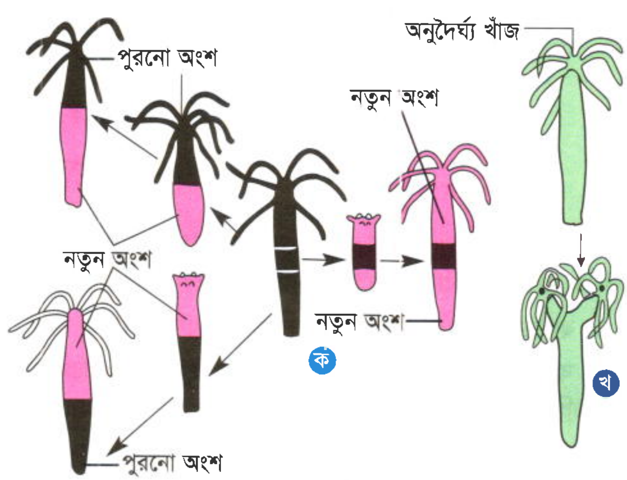

চিত্র ২.১.২৯ : (ক) একটি *Hydra* থেকে তিনটি (খ) দুই মাথাওয়ালা *Hydra* সৃষ্টি

Hydra-য় শ্রমবণ্টন (Division of Labour in *Hydra*)

বহুকোষী জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সুষম বণ্টনকে শ্রমবণ্টন বুঝায়। *Hydra* বহুকোষী প্রাণী হলেও অন্যান্য প্রাণীর মতো *Hydra*-র দেহে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়নি। কোষগুলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস স্তরে বিন্যস্ত থেকে এককভাবে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করে। *Hydra*-র শ্রমবণ্টন নিম্নরূপ:

ক. কোষভিত্তিক শ্রমবণ্টন

১. **পেশি-আবরণী কোষ :** এসব কোষ দেহের আবরণ তৈরি করে এবং দেহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা, চলন ও শিকার ধরার কাজে অংশ নেয়।

২. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ :** মুকুল, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়সহ দেহের যে কোন অংশ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **নিডোসাইট :** এসব কোষ আত্মরক্ষা, শিকার ধরা ও চলনে ব্যবহৃত হয়।

৪. **সংবেদী কোষ :** পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে।

৫. **স্নায়ু কোষ :** সংবেদী কোষে গৃহীত উদ্দীপনা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং সকল কোষের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৬. **গ্রন্থি কোষ :** গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গ্রন্থি কোষ মিউকাস ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম ক্ষরণ করে পরিপাকে সাহায্য করে। পাদ-চাকতিতে উপস্থিত গ্রন্থি কোষ থেকে নিঃসৃত আঠালো রস হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে সহায়তা করে এবং বুদবুদ গঠনের মাধ্যমে ভেসে চলতে সাহায্য করে।

৭. **পুষ্টি-পেশিকোষ :** বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে।

খ. আঙ্গিক শ্রমবণ্টন : *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, যেমন–

১. **মুখছিদ্র :** খাদ্য গ্রহণ ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে দায়িত্ব পালন করে।

২. **কর্ষিকা :** আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. **সিলেন্টেরন :** পরিপাক ও পরিবহন গহ্বর হিসেবে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে।

৪. **এপিডার্মিস :** প্রতিরক্ষাকারী, পেশিময় ও সংবেদী দেহাবরণ এবং আসঞ্জন পাদ-চাকতি গঠন করে।

৫. **মেসোগ্লিয়া :** এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষগুলোর ভিত্তিতল হিসেবে, দেহের কাঠামো নির্মাণে এবং কর্ষিকা ও দেহের সঙ্কোচন-প্রসারণে সহায়তা করে।

৬. **গ্যাস্ট্রোডার্মিস :** খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, উদ্দীপনা পরিবহন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত।

৭. **দেহকাণ্ড :** জনন অঙ্গ এবং মুকুল ধারণ করে।

৮. **পাদ-চাকতি :** কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে এবং চলনে সহায়তা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের কোষ এককভাবে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বলা যায় *Hydra*-য় শ্রমবণ্টন উল্লেখযোগ্য। **প্রাণিরাজ্যে *Hydra* তথা Cnidaria পর্বের প্রাণীতে সর্বপ্রথম কোষের গঠনমূলক বৈষম্য ও শ্রমবণ্টন দেখা যায়।**

Hydra-য় মিথোজীবিতা (Symbiosis in *Hydra*)

মিথোজীবিতা বা **সিমবায়োসিস** (symbiosis; গ্রিক. *sym* = together + *bios* = living) এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-একত্রে বাস করা। মিথোজীবিতা তিনটি ভিন্ন মাত্রার হতে পারে। তবে *Hydra*-র ক্ষেত্রে মিথোজীবিতার সংজ্ঞা হলো–

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে **মিথোজীবী** (symbiont) বলা হয়।

উদাহরণ– *Hydra viridissima* (=*Chlorohydra viridissima*) নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক এককোষী সবুজ শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়। *Zoochlorella* বা

চিত্র ২.১.৩০ : মিথোজীবিতায় অংশগ্রহণকারী দুটি জীব

সবুজ শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বাস করে। হাইড্রা অর্ধস্বচ্ছ প্রাণী হওয়ায় এ শৈবালের অন্তঃস্থ উপস্থিতি এ হাইড্রাকে সবুজ বর্ণ দান করে এবং এজন্য হাইড্রাটিও বাইরে থেকে সবুজ দেখায়। নিম্নোক্তভাবে এরা পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়। এরা একটি হতে অপরটি কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এমনকি ডিম্বাণুর সাথে শৈবালের অংশ হাইড্রার পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

শৈবালের প্রাপ্ত উপকার

i. **আশ্রয় :** শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্তঃকোষীয়) পেশি-আবরণী কোষে আশ্রয় পায়।
ii. **সালোকসংশ্লেষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2-কে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে।
iii. **খাদ্যোৎপাদন :** হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত N_2 জাত বর্জ্যপদার্থকে আমিষ তৈরির কাজে ব্যবহার করে।

Hydra-র প্রাপ্ত উপকার

i. **খাদ্যপ্রাপ্তি :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে।
ii. **শ্বসন :** সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে O_2 নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে।
iii. **CO_2 শোষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে।
iv. **বর্জ্য নিষ্কাশন :** হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2-ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জ্যপদার্থ মুক্ত হয়।

পরজীবিতা ও মিথোজীবিতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পরজীবিতা	মিথোজীবিতা
১. দুই জীবের মধ্যে সম্পর্ক	একটি প্রজাতি পোষক, অন্যটি পরজীবী।	উভয় প্রজাতিই পরস্পরের মিথোজীবী।
২. নির্ভরশীলতা	পরজীবী পোষকের উপর নির্ভরশীল।	মিথোজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল।
৩. ঘনিষ্ঠতা	পরজীবী পোষকের সাথে সবসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত নাও থাকতে পারে।	মিথোজীবিতায় একটি সদস্য সব সময় অন্যটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।
৪. উপকারিতা	পোষকের ক্ষতির বিনিময়ে পরজীবী আশ্রয়, খাদ্য ও জনন বিষয়ে উপকৃত হয়।	উভয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়।
৫. অভিযোজন	অভিযোজনের কারণে পরজীবীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।	অভিযোজনের কারণে মিথোজীবীদের কোন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না।
৬. সম্পর্কের স্থায়িত্ব	ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী।	চিরস্থায়ী।
৭. উদাহরণ	মানুষ ও *Plasmodium* (ম্যালেরিয়ার পরজীবী)।	*Hydra viridissima* (সবুজ হাইড্রা) ও *Zoochlorella* (এককোষী শৈবাল)।

Hydra কেন Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণী?

নিচে বর্ণিত কারণে *Hydra* কে Cnidaria পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে–

১. দেহের কেন্দ্রভাগে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** বা **সিলেন্টেরন** থাকে, যা কেবল মুখছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত।
২. ভ্রূণাবস্থায় **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি স্তর থাকে যেগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** গঠন করে।
৩. এপিডার্মিসে **নিডোসাইট** নামক বিশেষ ধরনের কোষ থাকে।
৪. দেহপ্রাচীরে বিদ্যমান **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** থেকে অন্যান্য প্রায় সকল ধরনের কোষ সৃষ্টি হয়।
৫. মুখছিদ্রকে ঘিরে **কর্ষিকা** দেখা যায়।

ব্যবহারিক অংশ

পরীক্ষণ : ১. *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ড পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড, কিংবা মডেল, অণুবীক্ষণযন্ত্র, চিত্র আঁকার জন্য শীট, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : শিক্ষার্থীরা গবেষণাগারে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড অথবা শিক্ষক প্রদত্ত *Hydra*-র মডেল পর্যবেক্ষণ করে, এটি শনাক্ত করবে, এর শ্রেণিবিন্যাস জানবে, ড্রইং শীটে এর চিহ্নিত চিত্র আঁকবে ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখবে।

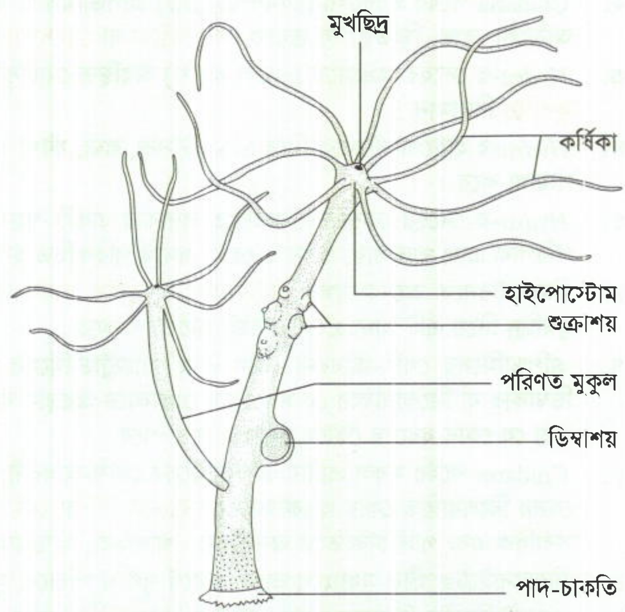

চিত্র ২.১.৩১ : *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ট

শনাক্তকরণ

১. দেহটি নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বন্ধ।

২. মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতি হাইপোস্টোমের চূড়ায় **মুখছিদ্র** অবস্থিত।

৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতার মতো **কর্ষিকা** রয়েছে।

৪. দেহের বদ্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার **পাদ-চাকতি** অবস্থিত।

৫. দেহে **মুকুল** দেখা যায়।

[**গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য** *Hydra* **সংগ্রহ :** গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য খুব সহজেই *Hydra* সংগ্রহ করা যায়। শীতের শুরুতে যখন পুকুর, ডোবা, হ্রদ বা খালের পানি কমতে শুরু করে তখন এসব জলাশয়ের মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার গভীর থেকে কিছু ডালপালা বা জলজ উদ্ভিদ কিংবা অন্য কোনো জলজ বস্তু তুলে আনতে হবে। যেহেতু *Hydra* সাধারণত কোনো বস্তুর সাথে আটকানো থাকে তাই পানি থেকে শুধু *Hydra* তুলে আনা সম্ভব নয়। জলাশয় থেকে সংগৃহিত এসব বস্তু পানিপূর্ণ একটি কাঁচের জার (Jar)-এ রেখে সেটি কিছু সময়ের জন্য আলোকিত স্থানে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydra* গুলো (যদি সংগৃহীত বস্তুগুলোতে থেকে থাকে) জারের তলদেশ বা পার্শ্বপ্রাচীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তখন পিপেট (pipette)-এর সাহায্যে এদেরকে পেট্রিডিস বা স্লাইডে উঠিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে নিরীক্ষণ করা হয়।]

পরীক্ষণ : ২. *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদের স্লাইড (T. S. of *Hydra*) পর্যবেক্ষণ

প্রদত্ত নমুনাটি *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

কারণ–

১. এটি দেখতে আংটির মতো এবং দ্বিস্তরবিশিষ্ট অর্থাৎ **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** নিয়ে গঠিত।

২. দুইস্তরের মাঝখানে অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** আছে।

৩. কেন্দ্রে গোলাকার **সিলেন্টেরন** উপস্থিত।

৪. এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস বিভিন্ন ধরনের কোষ, যেমন-পেশি-আরবণী, ইন্টারস্টিশিয়াল, গ্রন্থিকোষ, স্নায়ুকোষ, সংবেদী কোষ, নিডোসাইট ইত্যাদি দেখা যায়।

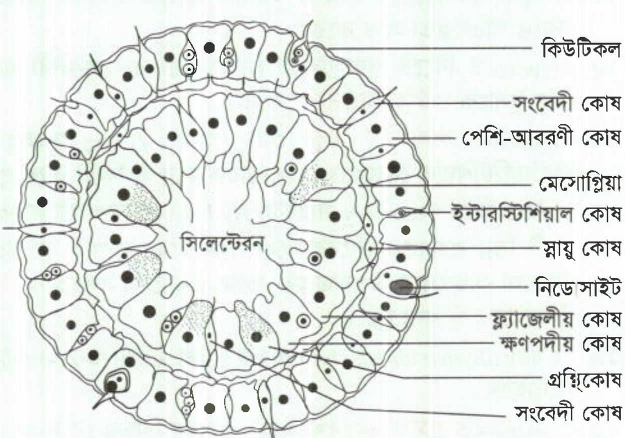

চিত্র ২.১.৩২ : *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. *Hydra* **দ্বিস্তরী** বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী** অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থায় এদের দেহপ্রাচীরের কোষগুলো **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিসে** পরিণত হয়।

২. Cnidaria পর্বের প্রাণিদের (যেমন–*Hydra*) এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত জেলির মতো আঠালো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে **মেসোগ্লিয়া** বা **মেসোল্যামিলা** বলে।

৩. *Hydra*-র দেহের অগ্রপ্রান্তে (ওরাল অংশে) অবস্থিত মোচাকৃতির অংশটিকে **হাইপোস্টোম** বলে। এর কেন্দ্রভাগে **মুখছিদ্র** বিদ্যমান।

৪. *Hydra*-র হাইপোস্টোমকে ঘিরে ৬-১০টি সরু, লম্বা, ফাঁপা ও সঙ্কোচনশীল **কর্ষিকা** থাকে যা শিকার ধরা ও চলনে সাহায্য করে।

৫. *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লম্বাকার একটি গহ্বরের নাম **সিলেন্টেরন**। এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক এবং খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয় বলে একে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** বলে।

৬. সিলেন্টেরনকে অনেক সময় **ব্লাইন্ড গাট** বা **ব্লাইন্ড স্যাক** বলা হয় কারণ দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একমাত্র মুখছিদ্র দিয়ে এটি খাদ্য গ্রহণ ও বর্জ্য পরিত্যাগ করে।

৭. এপিডার্মিসের পেশি-আবরণী কোষ এবং গ্যাস্ট্রোডার্মিসের পুষ্টি পেশিকোষের অন্তর্বর্তী ফাঁকাস্থানে গোলাকার, ডিম্বাকার বা ত্রিকোণাকার যে সব কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে তাদের **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** বলে। প্রয়োজনে এরা যে কোন ধরনের কোষে পরিণত হতে পারে।

৮. Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীর এপিডার্মিসের পেশি-আবরণী কোষসমূহের মধ্যবর্তীস্থানে অথবা কোষের অভ্যন্তরে যেসব বিশেষায়িত কোষ থাকে তাদের **নিডোসাইট** বা **নেমাটোসাইট** বলে। *Hydra*-র কর্ষিকাতে এদের সংখ্যা সর্বাধিক এবং পাদ-চাকতিতে অনুপস্থিত। খাদ্যধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে নিডোসাইট ব্যবহৃত হয়।

৯. নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশে তরল পদার্থে পূর্ণ ও প্যাঁচানো সূত্রক সম্বলিত ক্ষুদ্র থলির নাম **নেমাটোসিস্ট**।

১০. নেমাটোসিস্টের ভিতরের তরল পদার্থকে **হিপ্নোটক্সিন** বলে। এটি বিষাক্ত এবং আমিষ ও ফেনল সমন্বয়ে গঠিত।

১১. *Hydra*-র পরিপাক দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। কোষের বাইরে সিলেন্টেরনের মধ্যে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে **বহিঃকোষীয় পরিপাক** এবং ক্ষণপদযুক্ত কোষের অভ্যন্তরে খাদ্য গহ্বরের মধ্যে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে।

১২. *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের চলনের মধ্যে **লুপিং, সমারসল্টিং** ও **গ্লাইডিং** উল্লেখযোগ্য। সমারসল্টিং প্রক্রিয়ায় এরা দ্রুত চলাচল করে।

১৩. *Hydra*-তে অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় জনন ঘটে। অযৌন জননের **মুকুলোদ্গম** প্রক্রিয়াটি *Hydra*-র **স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া**।

১৪. কিছুসংখ্যক *Hydra*-উভলিঙ্গ হওয়ায় সত্ত্বেও স্বনিষেক ঘটাতে পারেনা, কারণ এদের শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই সাথে পরিপক্কতা লাভ করেনা।

১৫. *Hydra*-র নিরেট গ্যাস্ট্রুলাটি সিলিয়াযুক্ত বা মুক্তজীবী নয়। এটি মাতৃদেহের সাথে যুক্ত থাকে। এ ধরনের গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** বলে।

১৬. *Hydra*-র **স্বাভাবিক মৃত্যু** নেই। কারণ *Hydra*-দেহের কোন অংশ বিনষ্ট হলে এর দেহপ্রাচীরে অবস্থিত ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলো রূপান্তরিত হয়ে ঐ বিনষ্ট অংশ পুনরুদ্ধার করতে পারে।

১৭. ১৭৪৪ সালে Trembley সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। তিনিই *Hydra*-র **আবিষ্কারক**।

১৮. দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে যখন এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে তাদের ঘনিষ্টভাবে সহাবস্থানের ফলে একে অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এধরনের সম্পর্ককে **মিথোজীবিতা** বলে। জীব দুটিকে তখন **মিথোজীবী** বা **সিমবায়োন্ট** বলা হয়।

১৯. *Chlorohydra viridissima* নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক এককোষী শৈবাল মিথোজীবিতার প্রকৃত উদাহরণ।

২০. *Hydra*-তে **শ্রমবন্টন** দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন কোষ বা অঙ্গ নির্দিষ্ট শ্রমবন্টন দ্বারা *Hydra*-র দেহের সামগ্রিক কাজ সম্পন্ন করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাইড্রার ক্ষেত্রে কোন প্রতিসাম্য পরিলক্ষিত হয় ?
ক) গোলীয় প্রতিসাম্য খ) অপ্রতিসাম্য
গ) অরীয় প্রতিসাম্য ঘ) দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য

২. জননাঙ্গ সৃষ্টি হয়–
ক) গ্রীষ্ম ও বর্ষা খ) হেমন্ত ও শীত
গ) গ্রীষ্ম ও শীত ঘ) শীত ও বসন্ত

৩. মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে কোন ধরনের কোষের আধিক্য থাকে ?
ক) পেশি-আবরণী কোষ খ) স্নায়ু কোষ
গ) সংবেদী কোষ ঘ) গ্রন্থি কোষ

৪. লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা কোন চলন ব্যবহার করে ?
ক) সমারসল্টিং খ) লুপিং গ) গ্লাইডিং ঘ) হামাগুড়ি

৫. অন্তঃত্বকীয় কোন কোষ পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরণ করে ?
ক) গ্রন্থি কোষ খ) স্নায়ু কোষ
গ) সংবেদী কোষ ঘ) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

৬. কোন ক্ষেত্রে হাইড্রা উল্টোভাবে ধীর গতিতে চলন সম্পন্ন করে ?
ক) সাঁতার খ) হাঁটা গ) ভাসা ঘ) গ্লাইডিং

৭. *Hydra*-তে নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি কোথায় থাকে ?
ক) কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে খ) কর্ষিকার অন্তঃপ্রাচীরে
গ) কর্ষিকার নিচে ঘ) কর্ষিকার উপরে

৮. নিডোসাইট কোষের ক্ষেত্রে যে উক্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ–
i. আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয় ii. খাদ্যগ্রহণে সহায়তা করে
iii. চলন কার্যে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. হাইড্রার পরিপাক-এর ক্ষেত্রে এনজাইমের ভূমিকা–
i. ট্রিপসিন আমিষকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে
ii. অ্যামাইলেজ শর্করাকে পলিপেপটাইড-এ পরিণত করে
iii. লাইপেজ স্নেহ পদার্থকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট এর কাজ–
i. অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলা ii. চলন ঘটানো
iii. শিকারকে আটকে ধরে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. স্পার্মাটোজেনেসিস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. স্পার্মাটোসাইট থেকে ৪টি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়
ii. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মিয়োসিস বিভাজনে স্পার্মাটোগনিয়া সৃষ্টি করে
iii. স্ফীত মস্তক, সংকীর্ণ মধ্যখন্ড ও লম্বা বিচলনক্ষম লেজ নিয়ে শুক্রাণু গঠিত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. এপিডার্মিসের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়
ii. আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়
iii. পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মের পুষ্টি কোষ সাধারণত দুধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। যথা–ফ্ল্যাজেলীয় কোষ ও ক্ষণপদীয় কোষ; যা পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৩. উদ্দীপকের কোন কোষটি অন্তঃকোষীয় পরিপাকে অংশ নেয় ?
ক) ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ খ) ক্ষণপদীয় কোষ
গ) এনজাইম ক্ষরণকারী কোষ
ঘ) মিউকাস ক্ষরণকারী কোষ

১৪. পুষ্টি কোষের কাজ হলো–
i. খাদ্য গলাধঃকরণে সহায়তা করে
ii. খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা রাখে
iii. মুখছিদ্রে পানি প্রবেশ করতে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা				
১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক
৬. খ	৭. ক	৮. ঘ	৯. খ	১০. গ
১১. খ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. গ	

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

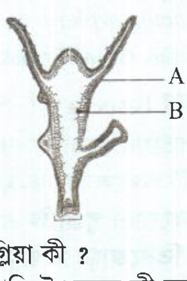

ক) মেসোগ্লিয়া কী ? ১
খ) নেমাটোসিস্ট বলতে কী বুঝ ? ২
গ) উদ্দীপকের চিত্রে A ও B অংশে পার্থক্য লিখ। ৩
ঘ) উদ্দীপকে চিত্রে A অংশে বিদ্যমান কোষগুলির কাজ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২.২ প্রতীক প্রাণী : ঘাসফড়িং (The Grasshopper, *Poekilocerus pictus*)

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❒ ঘাসফড়িং-এর গঠন	পাঠ ১	ঘাসফড়িং-এর বহির্গঠন
❒ ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি	পাঠ ২	ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র
❒ **ব্যবহারিক** : ঘাসফড়িং / আরশোলার মুখোপাঙ্গ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৩	**ব্যবহারিক:** ঘাসফড়িং/তেলাপোকার মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ
❒ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্তকরণ	পাঠ ৪	**ব্যবহারিক:** ঘাসফড়িং/ তেলাপোকার পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাকগ্রন্থি ব্যবচ্ছেদ ও পর্যবেক্ষণ
❒ ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি	পাঠ ৫	ঘাসফড়িং-এর সংবহন
❒ ঘসিফড়িং-এর শ্বসন পদ্ধতি	পাঠ ৬	ঘাসফড়িং-এর শ্বসন
❒ ঘাসফড়িং-এর রেচন পদ্ধতি	পাঠ ৭	ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ
❒ ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর	পাঠ ৮	ঘাসফড়িং-এর রেচনতন্ত্র
❒ ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির গঠন ও দর্শন কৌশল	পাঠ ৯	ঘাসফড়িং-এর প্রজননতন্ত্র
	পাঠ ১০	ঘাসফড়িং-এর প্রজনন ও রূপান্তর

ঘাসফড়িং Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণিভুক্ত একটি সুলভ প্রাণী। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সবখানে সবুজ শস্যক্ষেত বা সবজির বাগানে বিভিন্ন ধরনের ঘাসফড়িং একা বা দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। ঘাসফড়িং-এর কিছু প্রজাতি **পঙ্গপাল** (locust) নামে পরিচিত। এগুলো বাদামি বর্ণের মাঝারি আকৃতির পতঙ্গ এবং ঝাঁক বেঁধে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও এগুলো সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে মুহুর্তের মধ্যে একটি ক্ষেতের সমস্ত ফসল খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে। পঙ্গপাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের শস্যক্ষেতের জন্য মারাত্মক হুমকি।

ঘাস ও লতাপাতার মধ্যে থেকে সেখানেই লাফিয়ে চলে, তাই এর নাম হয়েছে ''ঘাসফড়িং''। সাম্প্রতিক (২০২১) শ্রেণিবিন্যাসে *Poekilocerus pictus*-সহ সমস্ত ঘাসফড়িং ও পঙ্গপাল (locust) কে আকৃতি ও জিনঘটিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়। ফলে *Poekilocerus pictus*-এর গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে Pyrgomorphidae (আগে ছিল Acrididae)। এ শ্রেণিবিন্যাস ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে বাংলাদেশের বইগুলোতেও অন্তর্ভুক্ত হবে আশা করি।

পৃথিবীতে প্রায় বিশ হাজার প্রজাতির ঘাসফড়িং শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে **বিশ প্রজাতির** ঘাসফড়িংয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে–*Acrida exaltata, Phlaeoba infumata, Choroedocus robustus, Xenocatantops humilis, Chondracris rosea, Cyrtacanthacris tatarica, Eyprepocnemis rosea, Aulacobothrus luteipes, Hieroglyphus banian, Gastrimargus marmoratus, Oedaleus abruptus, Sphingonotus longipennis, Trilophidia annulata, Gesonula punctifrons, Oxya fuscovittata, Spathosternum prasiniferum, Atractomorpha crenulata, Chrotogonus trachypterus,* এবং *Poekilocerus pictus.*

[***Reference:*** Srinivasan, G. and Prabakar, D. 2013. A Pictorial Handbook on Grasshoppers of Western Himalayas.]

ঘাসফড়িং কেন Insecta বা 'পতঙ্গ' শ্রেণিভুক্ত প্রাণী? Reading

১. অন্যান্য পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িং-এর দেহ **কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল** দিয়ে আবৃত।
২. দেহ তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত-**মস্তক, বক্ষ** ও **উদর**।
৩. মস্তকে একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** এবং একজোড়া **অ্যান্টেনা** রয়েছে।
৪. বক্ষদেশে **তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা** ও **দুজোড়া ডানা** থাকে।
৫. **ট্রাকিয়া** নামক শাখা-প্রশাখাযুক্ত বায়ু নালিকার মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে।
৬. রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত ধরনের।
৭. **ম্যালপিজিয়ান নালিকার** সাহায্যে রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

RMDAC

বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘাসফড়িং-এর ছবি

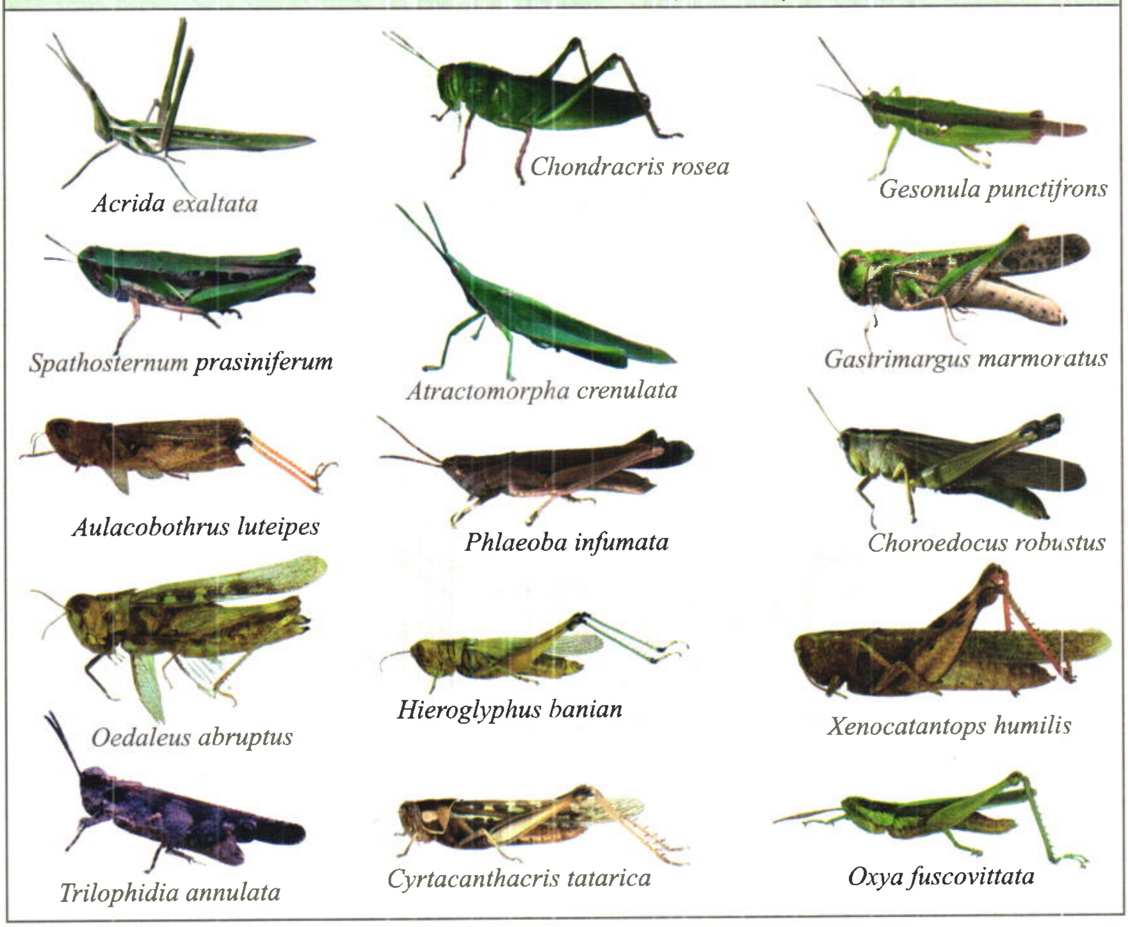

ঘাসফড়িং-এর শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Kingdom : Animalia (প্রাণী)
Phylum : Arthropoda (সন্ধিপদী, কাইটিননির্মিত বহিঃকঙ্কাল)
Class : Insecta (দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর-এ বিভক্ত)
Subclass : Pterygota (ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ)
Order : Orthoptera (দুজোড়া ডানাবিশিষ্ট)
Family : Pyrgomorphidae (রঙিন ঘসিফড়িং)
Genus : *Poekilocerus*
Species : *Poekilocerus pictus*

চিত্র ২.২.১ : *Poekilocerus pictus*

বাসস্থান (Habitat) : ঘাসফড়িং যেহেতু ঘাস, পাতা, শস্য ও শস্যের কচিপাতা আহার করে সে কারণে এমন ধরনের নিচু বসতি এদের পছন্দ। মূলত সব ধরনের আবাসেই (তৃণভূমি, বারিবন, চারণভূমি, মাঠ, মরুভূমি, জলাভূমি প্রভৃতি) বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসফড়িং দেখা যায়। স্বাদুপানির ও ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে যেহেতু পানির উঠানামা বেশি হয় এবং ডিম পাড়ার জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় সে কারণে এসব বসতিতে ঘাসফড়িং কম বাস করে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘাসফড়িং বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী (migratory) হয়, তখন দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

খাদ্য (Food) : ঘাসফড়িং **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ডিম থেকে ফোটার পরপরই, নিম্ফ অবস্থায় ঘাসফড়িং চার পাশের যে কোন ছোট ছোট, সহজপাচ্য গাছ, ঘাস বা নতুন কোমল শাখা-প্রশাখা খেতে শুরু করে। দু-একবার খোলস মোচনের পর একটু বড় হলে শক্ত উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তরুণ ঘাসফড়িং পূর্ণাঙ্গদের মতোই নির্দিষ্ট উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তখন খাদ্য তালিকায় ঘাস, পাতা ও শস্য প্রধান খাবার হিসেবে উঠে আসে। বেশির ভাগ ঘাসফড়িং অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে আহার সংগ্রহ করে, দু-একটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ থেকে আহার গ্রহণ করে।

বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান (External Morphology)

ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার (cylindrical) এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী লম্বায় ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের রঙ অনেকটা হলদে-সবুজ (yellowish green) ধরনের অথবা বাদামি রঙের মাঝে নানা ধরনের ফোঁটা (spots) বা ডোরাকাটা (markings) হতে পারে। মিশ্রিত এ রঙ তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে এমনকি শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু ঘাসফড়িং আছে উজ্জ্বল নীল-হলুদ রঙের (যেমন-*Poekilocerus pictus*)।

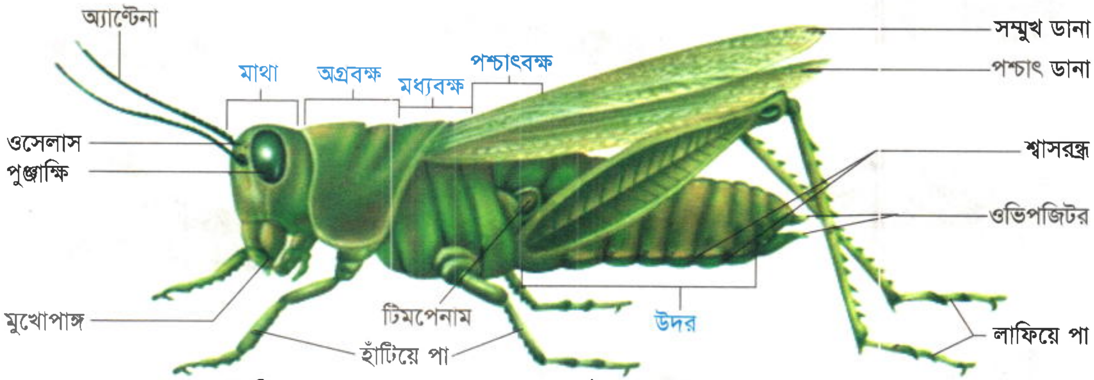

চিত্র ২.২.২ : ঘাসফড়িং-এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)

ঘাসফড়িং-এর দেহ **কাইটিন** (chitin) নির্মিত **কিউটিকল** (cuticle) নামক বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত থাকে। প্রতি দেহখণ্ডকে কিউটিকল পুরু ও শক্ত পাতের মতো গঠন সৃষ্টি করে। এদের **স্ক্লেরাইট** (sclerites) বলে। দুটি স্ক্লেরাইটের মধ্যবর্তী কিউটিকল পাতলা ও নরম থাকে। এদেরকে **সুচার** (sutures) বলে। সুচারের উপস্থিতির কারণে দেহখণ্ডক ও উপাঙ্গগুলো সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। কিউটিকলের ভিতরে ও নিচে নানা ধরনের রঞ্জক পদার্থ (pigments) থাকায় ঘাসফড়িং-এ বর্ণময়তা দেখা যায়।

প্রতি দেহখণ্ডকের পৃষ্ঠদেশীয় পাতকে **টার্গাম** বা **টারগাইট** (tergum or tergite) এবং অঙ্কদেশীয় পাতকে **স্টার্নাম** বা **স্টার্নাইট** (sternum or sternite) বলে। এরা পার্শ্বদেশে **প্লিউরা** বা **প্লিউরাইট** (pleura or pleurite) পাত দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে।

ঘাসফড়িং-এর দেহ খণ্ডকায়িত এবং অন্যসব পতঙ্গের মতো তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন–

ক. **মস্তক (Head)** – পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনা ও মুখোপাঙ্গ বহন করে।
খ. **বক্ষ (Thorax)** – তিনজোড়া পা ও দুজোড়া ডানার সংযোগ সাধন করে এবং বহন করে।
গ. **উদর (Abdomen)** – শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (spiracle) এবং জনন অঙ্গসমূহ (genitaliae) ধারণ করে।

ক. মস্তক (Head)

বাইরে থেকে অখণ্ডকিত (একক) মনে হলেও মূলত ৬টি ভ্রূণীয় খণ্ডকের (embryonic segments) সমন্বয়ে মস্তক গঠিত। এটি দেখতে নাশপাতি আকৃতির এবং **হাইপোগন্যাথাস** (hypognathous) ধরনের অর্থাৎ মুখছিদ্র নিম্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান করে। মস্তক একটি ছোট ও স্থিতিস্থাপক **গ্রীবার** সাহায্যে বক্ষলগ্ন হয়ে দেহের সমকোণে অবস্থান

করে। ঘাসফড়িং গ্রীবার সাহায্যে মস্তককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে পারে। মস্তকের বহিঃকঙ্কালের নাম **হেড ক্যাপসুল** (head capsule) বা **এপিক্রেনিয়াম** (epicranium)। মস্তকের বহিঃকঙ্কাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যেমন– পৃষ্ঠদেশের ত্রিকোণা অংশটি **ভার্টেক্স** (vertex), দুপাশে অবস্থিত **জেনা** (gena), কপালের দিকে চওড়া **ফ্রন্স** (frons) এবং ফ্রন্সের নিচে আয়তাকার প্লেটটি **ক্লাইপিয়াস** (clypeus)। ঘাসফড়িং-এর মস্তক একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি**, তিনটি **সরলাক্ষি** বা **ওসেলি** (ocelli), একজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও এক সেট **মুখোপাঙ্গ** বহন করে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

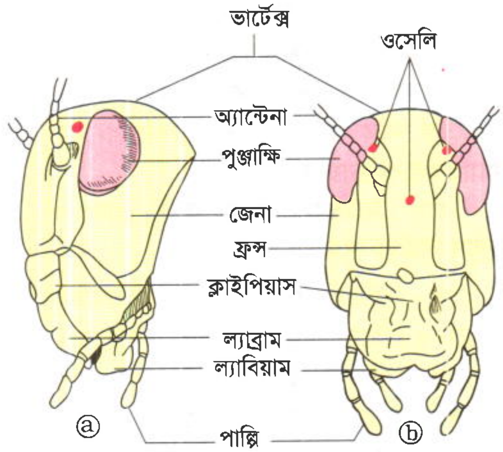

চিত্র ২.২.৩ : ঘাসফড়িং-এর মস্তক; a. পার্শ্বদৃশ্য এবং b. সম্মুখদৃশ্য

১. পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয়পাশে পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে, ১ম খণ্ডকে একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** থাকে। এগুলো অবৃন্তক এবং মস্তকের এক বিরাট অংশ দখল করে থাকে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে ঘাসফড়িং যে কোনো আর্থ্রোপোড অপেক্ষা উন্নত। এরা সম্ভবত রঙিন বস্তুও সঠিকভাবে দেখতে পায়। গঠনগত ও কার্যকারিতার দিক থেকে ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি আর্থ্রোপোড প্রাণীর মতো। অসংখ্য **ওমাটিডিয়া** (ommatidia)-র সমন্বয়ে একেকটি পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। ওমাটিডিয়াই পুঞ্জাক্ষির গঠন ও কাজের একক।

২. ওসেলি (Ocelli; একবচনে-Ocellus) : ঘাসফড়িং-এর দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝখানে তিনটি সরলাক্ষি বা **ওসেলি** থাকে। প্রত্যেক ওসেলাস পুরু, স্বচ্ছ কিউটিকলনির্মিত লেন্স ও একগুচ্ছ আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষ রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ। ওসেলাসের তলদেশে মস্তিষ্কে গমনকারী **স্নায়ুতন্তু** (nerve fibre) অবস্থিত। এর ভিতরে আলোক সংবেদী কোষ থাকে যা রেটিনার মতো কাজ করে।

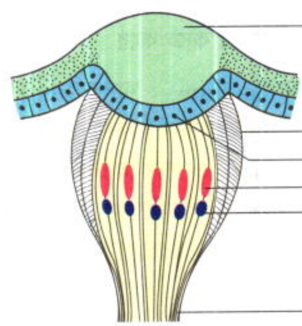

চিত্র : ২.২.৪ : একটি ওসেলাস

৩. অ্যান্টেনা (Antenna; বহুবচনে-Antennae) বা শুঙ্গ : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির সামনে, মাথার দুপাশে দুটি লম্বা **অ্যান্টেনি** প্রসারিত থাকে। অ্যান্টেনিদুটি সামনে রেখে চলাফেরা করে এবং ইচ্ছামতো এগুলোকে নাড়াতে পারে। এদুটি নাড়িয়ে এরা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শব্দতরঙ্গ অনুভব করে। **স্কেপ, পেডিসেল** ও **ফ্লাজেলাম**-এ তিনটি অংশ নিয়ে প্রত্যেক অ্যান্টেনা গঠিত। পেডিসেল খাটো ও অবিভক্ত। ফ্লাজেলাম বেশ লম্বা ও প্রায় ২৫ খণ্ডকে বিভক্ত।

৪. মুখোপাঙ্গ (Mouth Parts) : মুখের চারদিক ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে **মুখোপাঙ্গ** বলে। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। কচিপাতা বা কাণ্ড চর্বনে ব্যবহৃত হয় বলে ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গকে **চর্বন–উপযোগী** (chewing) বা **ম্যান্ডিবুলেট** (mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে। পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে মুখোপাঙ্গ গঠিত– ল্যাব্রাম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম ও হাইপোফ্যারিংক্স।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ

❒ **ল্যাব্রাম (Labrum) :** এটি দেখতে অনেকটা চাপা চাকতির মতো এবং উপরের **ওষ্ঠ** (lip) গঠন করে। রঙ সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে। এর মাঝ বরাবর অংশে একটি খাঁজ দেখা যায়।

কাজ : (i) এটি ম্যান্ডিবল দুটিকে ঢেকে রাখে। (ii) খাবার ধরে রাখে এবং ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে। (iii) খাবারের স্বাদ নিতে সাহায্য করে।

❑ **ম্যান্ডিবল (Mandible) :** মুখছিদ্রের দুপাশে অবস্থিত, তিনকোণা ও কালো বা বাদামি রঙের বেশ শক্ত ও ভিতরের দিকে সুঁচালো করাতের মতো দাঁতযুক্ত দুটি উপাঙ্গের নাম **ম্যান্ডিবল** বা **চোয়াল**।

কাজ : ম্যান্ডিবল খাদ্যবস্তু কর্তন, পেষণ ও চর্বণে সাহায্য করে।

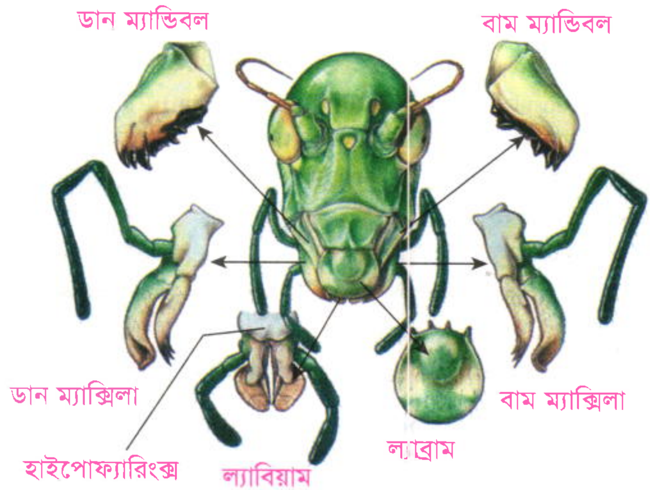

চিত্র : ২.২.৫ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের অবস্থান

❑ **ম্যাক্সিলা (Maxilla) :** ম্যান্ডিবলের পিছনে ও বাইরের দিকে প্রতিপাশে একটি করে লম্বাকার **ম্যাক্সিলা** থাকে। প্রত্যেক ম্যাক্সিলা কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত। সবচেয়ে গোড়ার খণ্ডটিকে **কার্ডো** (cardo) ও এরপর অবস্থিত খণ্ডককে **স্টাইপস** (stipes) বলে। স্টাইপসের অগ্রভাগে নখের মতো **ল্যাসিনিয়া** (lacinia) ও ঢাকনির মতো **গ্যালিয়া** (galea) নামক দুটি খণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে। গ্যালিয়ার পাশে পাঁচ অংশবিশিষ্ট **ম্যাক্সিলারি পাল্প** (maxillary palp) রয়েছে। এর উপর থাকে সূক্ষ্ম রোম।

কাজ : (i) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, এটি ধরে রাখতে, মুখের ভিতর প্রবেশ করাতে এবং খাদ্য চূর্ণকরণে সাহায্য করা ম্যাক্সিলার কাজ। (ii) ম্যাক্সিলারি পাল্প অ্যান্টেনা ও পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কারে অংশ নেয়, খাদ্যবস্তু হরণ প্রতিরোধ করে এবং সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

❑ **ল্যাবিয়াম (Labium) :** ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের নিচে মধ্যাংশ বরাবর স্থানে বহুসন্ধিল একটি **ল্যাবিয়াম** বা **অধঃওষ্ঠ** রয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলির প্রতিনিধি মনে করা হয়। এটি মূলত দুটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা–**মেন্টাম** (mentum) ও **সাবমেন্টাম** (submentum)। প্রতিপাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল **লিগুলি** (ligulae) ও তিন সন্ধিযুক্ত **ল্যাবিয়াল পাল্প** (labial palp) থাকে। প্রত্যেক লিগুলার ভিতরের দিকে অতিক্ষুদ্র **গ্লোসা** (glossa) ও বাইরের দিকে **প্যারাগ্লোসা** (paraglossa) অবস্থিত।

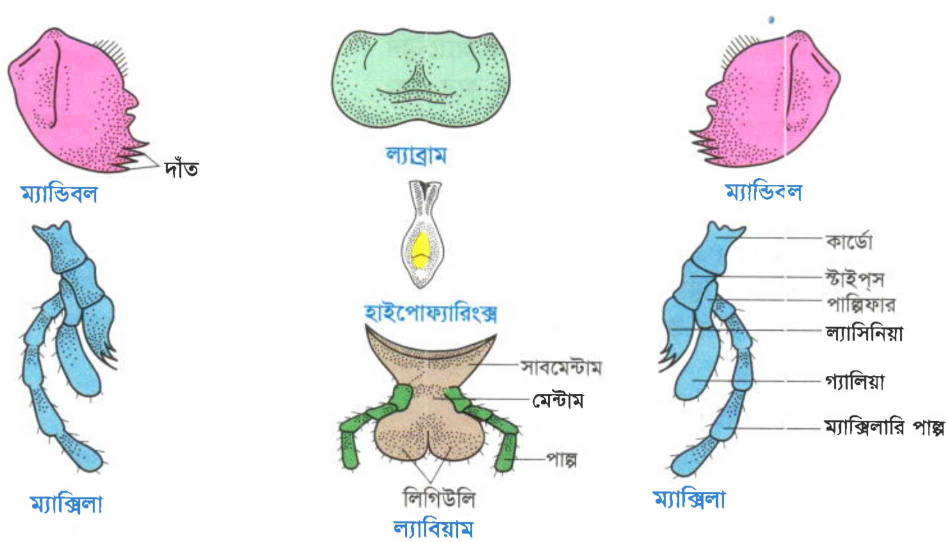

চিত্র ২.২.৬ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

কাজ : (i) এটি মুখের নিম্ন ওষ্ঠ গঠন করে। (ii) খাদ্যকে মুখে প্রবেশ করতে ও ধরে রাখতে সাহায্য করে। (iii) ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদী অঙ্গরূপে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ ও খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করে।

❑ **হাইপোফ্যারিংক্স (Hypopharynx) :** ল্যাব্রামের নিচে ক্ষুদ্র, মাংসল **হাইপোফ্যারিংক্স** বা **উপজিহ্বাটি** অবস্থিত। এটি চারদিকে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভিতরের কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিল্লি হাইপোফ্যারিংক্সের অঙ্কীয়তলের সাথে যুক্ত থাকে। এটি **লিংগুয়া** (lingua) নামেও পরিচিত।

কাজ : খাদ্যবস্তুকে নড়াচড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করা এর কাজ।

খ. বক্ষ (Thorax)

মস্তকের পিছনে মাংসল বক্ষ একটি খাটো, সরু ও নমনীয় **গ্রীবা** (neck)-র সাহায্যে যুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষাঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা–**অগ্রবক্ষ** (prothorax), **মধ্যবক্ষ** (mesothorax) এবং **পশ্চাৎবক্ষ** (metathorax)। প্রত্যেক অংশের পৃষ্ঠদেশ **টার্গাম** (tergum), অঙ্কীয়দেশ **স্টার্নাম** (sternum) ও পার্শ্বদেশ **প্লিউরন** (pleuron)-এ গঠিত। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। অগ্রবক্ষের টার্গাম অংশটি বেশ বড়, চওড়া এবং পিছনে ও পাশে প্রসারিত। এর নাম **প্রোনোটাম** (pronotum)। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে শ্বাসরন্ধ্র, ডানা ও পা।

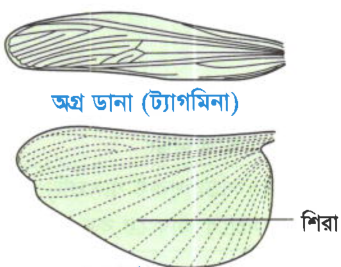

চিত্র ২.২.৭ : ঘাসফড়িং-এর ডানা

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : বক্ষের অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশে দুজোড়া **শ্বাসরন্ধ্র** বা **স্পাইরাকল** অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটামের নিচে অগ্র ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত।

২. ডানা (Wings) : মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের পিঠের দিকে অর্থাৎ টার্গাম ও প্লিউরনের মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজোড়া করে, মোট দুজোড়া পাতলা কিউটিকল নির্মিত **ডানা** রয়েছে। ডানাগুলো প্রথম অবস্থায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাচীর হিসেবে থলির মতো সৃষ্টি হয়, পরে পূর্ণাঙ্গ ডানায় পরিণত হয়। প্রত্যেক ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত। দুজোড়া ডানার গঠন ও কাজ ভিন্ন ধরনের। মধ্যবক্ষীয় (mesothoracic) ডানা অর্থাৎ সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পিছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। সেজন্য এগুলোকে **এলিট্রা** (elytra), ডানার আবরণ (wing covers) বা **টেগমিনা** (tegmina) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পিছনের বা পশ্চাৎবক্ষীয় (metathoracic) ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো (membranous), স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে। বিশ্রামের সময় পিছনের ডানাজোড়া সামনের ডানার নিচে গুটানো থাকে। MAT: 2015-16

৩. পা (Legs) : বক্ষের প্রত্যেক অংশে একজোড়া করে মোট **তিনজোড়া পা** রয়েছে। প্রতিটি পা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত: একেবারে গোড়ায় স্থূল, তিনকোণা **কক্সা** (coxa); এর পরের ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র **ট্রোক্যান্টার** (trochanter); পরের লম্বা, নলাকার ও দৃঢ় **ফিমার** (femur); তার পরবর্তী সরু **টিবিয়া** (tibia); এবং সবশেষে **টার্সাস** (tarsus)। টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে **টার্সোমিয়ার** (tarsomeres) বলে। প্রথম টার্সাসোমিয়ারের প্রান্তে দুটি বাঁকানো **নখর** (claws) থাকে। নখর দুটির মাঝে **পালভিলাস** (pulvilus) নামক একটি আসঞ্জন প্যাড থাকে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়। তবে ফিমার অংশ অনেক বড় ও মাংসল গড়নের হওয়ায় এরা লাফিয়ে দূরের পথ অতিক্রম করতে পারে। এ ধরনের পাকে **স্যালটাটোরিয়াল পা** (saltatorial legs) বলে। টিবিয়া ও টার্সাস শক্ত কাঁটাযুক্ত হওয়ায় আহার ধরতে সাহায্য করে।

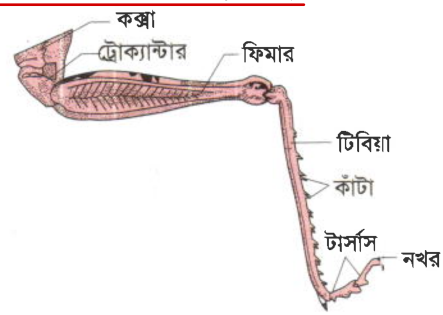

চিত্র ২.২.৮ : ঘাসফড়িং-এর একটি পায়ের বিভিন্ন অংশ

গ. উদর (Abdomen)

ঘাসফড়িং-এর উদর বেশ লম্বা, সরু ও ১১ খণ্ডকে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডকের পৃষ্ঠদেশে **টার্গাম** (tergum) এবং অঙ্কীয়দেশে **স্টার্নাম** (sternum) থাকে, কোন প্লিউরন থাকে না। ১ম উদরীয় খণ্ডকটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এর স্টার্নাম পশ্চাৎবক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এতে শুধু টার্গাম থাকে। ঘাসফড়িং-এর উদরাঞ্চল নিচে বর্ণিত অঙ্গগুলো বহন করে।

১. টিমপেনাম (Tympanum) : ১ম খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে পর্দা রয়েছে যা শ্রবণ অঙ্গ বা **শ্রবণ থলি** (auditory sac)-কে আবৃত রাখে। এর নাম **টিমপেনিক পর্দা** বা **টিমপেনাম**।

২. শ্বাসরন্ধ্র (Spiracle) : ১ম থেকে ৮ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খন্ডকের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট আটজোড়া **শ্বাসরন্ধ্র** বা **স্পাইরাকল** থাকে যার প্রথমটি অন্যগুলো হতে আকারে বড়।

৩. পায়ু ও বহিঃজনন অঙ্গ : ঘাসফড়িংয়ের শেষ উদরীয় খণ্ডকটি প্রজননের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। পুরুষে এটি গোল কিন্তু স্ত্রীতে সূচালো। উভয়ক্ষেত্রে নবম ও দশম খণ্ডকের টার্গা আংশিকভাবে একীভূত থাকে। পুরুষের একাদশ খণ্ডকের টার্গামটি পায়ুর উপরে **সুপ্রা অ্যানাল প্লেট** (supra anal plate) গঠন করে। এদের দশম খণ্ডকের পিছন দিকে দুটি **অ্যানাল সারকি** (anal circi) থাকে। নবম খণ্ডকের স্টার্নাম লম্বা হয়ে **সাবজেনিটাল প্লেট** গঠন করে যা উক্ত খণ্ডকের শেষে অবস্থিত জনন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে। স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম লম্বা ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ **ওভিপজিটর** (ovipositor) গঠন করে।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং এর মধ্যে পার্থক্য [DAT- 2022-23]

তুলনীয় বিষয়	পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১. আকার	একই বয়সের পুরুষ ঘাসফড়িং স্ত্রী ঘাসফড়িং এর তুলনায় আকারে ছোট।	সমান বয়সের স্ত্রী ঘাসফড়িং পুরুষ ঘাসফড়িং এর চেয়ে তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
২. উদর	এদের উদর গোলাকার ও লম্বাটে।	উদর প্রশস্ত ও প্রান্তভাগ সূচালো।
৩. পা	অপেক্ষাকৃত ছোট।	পুরুষের তুলনায় বড়।
৪. পাখনা	উদরকে আবৃত করার পরও দুপাশে কিছুটা বাড়ানো।	শুধু উদরকে আবৃত করে রাখে।
৫. স্টার্নাম	৯ম খণ্ডকের স্টার্নাম বর্ধিত হয়ে **সাবজেনিটাল প্লেট** গঠন করে যা জনন ছিদ্রের আবরণ হিসেবে কাজ করে।	৯ম খণ্ডকের স্টার্নাম বর্ধিত ও কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে **ওভিপজিটর**-এ পরিণত হয়, যা ডিম পাড়ার অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
৬. সঙ্গম অঙ্গ	১০ম দেহ খণ্ডকের উভয় পাশে একটি করে ছোট সঙ্গম অঙ্গ রয়েছে, যা **অ্যানাল সারকি** নামে পরিচিত।	অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় কোনো ধরনের সঙ্গম অঙ্গ নেই।
৭. টার্গাম	১১তম খণ্ডকের টার্গাম **সুপ্রাঅ্যানাল প্লেট**-এ রূপান্তরিত, যা পায়ু ছিদ্রের ঢাকনা হিসেবে কাজ করে।	৯ম ও ১০ম খণ্ডকের টার্গা আংশিকভাবে একীভূত।
৮. জনন রন্ধ্র	উদরের নবম খণ্ডকে **পুংজনন** রন্ধ্র থাকে।	উদরের ৮ম ও ৯ম খণ্ডক মিলে **স্ত্রীজনন রন্ধ্র** গঠিত হয়।
৯. চিত্র	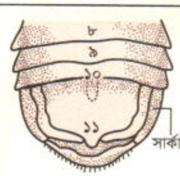 ক. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য 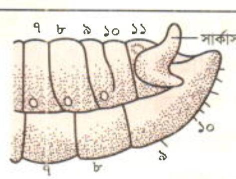 খ. পার্শ্বীয় দৃশ্য	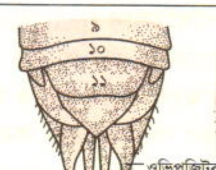 গ. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য 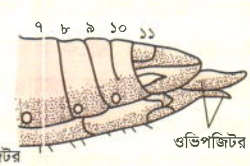 ঘ. পার্শ্বীয় দৃশ্য

ঘাসফড়িং-এর সিলোম ও অন্তর্গঠন (Coelom and Internal Structures of Grasshopper)

শুধু ভ্রূণেই দেহ গহ্বরটি **সিলোম** (coelom) আকারে অবস্থান করে। পরিণত প্রাণীতে যে গহ্বর দেখা যায় তা ভ্রূণের **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) এবং সিলোম গহ্বরের সংযুক্তির ফলে সৃষ্ট। এর নাম **মিক্সোসিল** (mixocoel)। ভ্রূণীয় সিলোমপ্রাচীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠনে ব্যবহৃত হয়। মিক্সোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় বলে এটি **হিমোসিল** (haemocoel) নামে অভিহিত এবং প্রবাহমান তরল পদার্থ হচ্ছে **হিমোলিম্ফ** (haemolymph)।

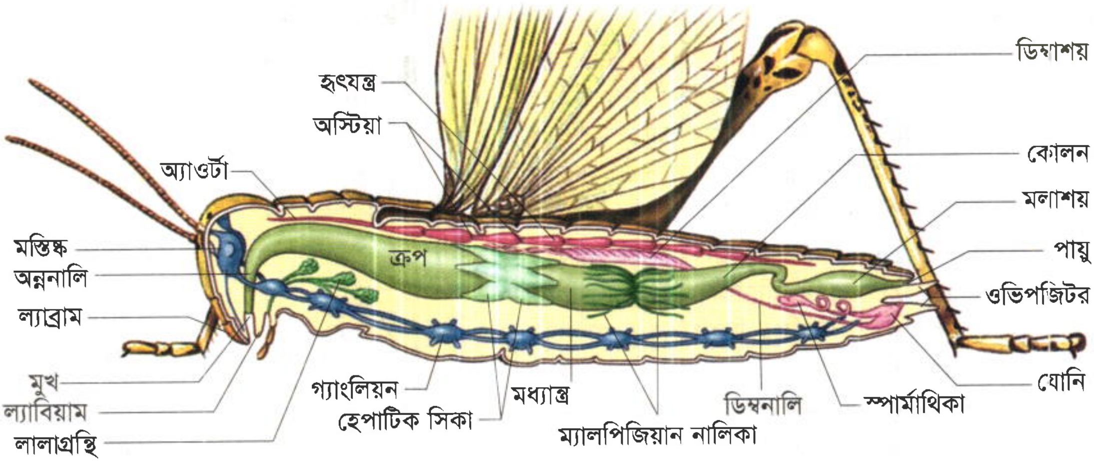

চিত্র ২.২.৯ : স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর অন্তর্গঠন (বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র দেখানো হয়েছে)

দেহের পৃষ্ঠদেশে রক্ত সংবহনতন্ত্রের **অ্যাওর্টা** ও **হৃৎযন্ত্র;** অঙ্কীয়দেশে **স্নায়ুরজ্জু** এবং দেহের মাঝ বরাবর পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ অবস্থান করে। সম্মুখ অংশের তলদেশে **লালাগ্রন্থি** প্রসারিত থাকে। মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** হিমোসিলে বিস্তৃত। **ট্রাকিয়াল তন্ত্র** সমগ্রদেহে বিস্তৃত থাকে। হিমোসিলের অভ্যন্তরে অন্যান্য অঙ্গাণু দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System of Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত এবং প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-**পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি**। ছকের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

পৌষ্টিকতন্ত্র

- পৌষ্টিকনালি
  - স্টোমোডিয়াম
    - ১. মুখছিদ্র
    - ২. গলবিল
    - ৩. গ্রাসনালি
    - ৪. ক্রপ
    - ৫. গিজার্ড
  - মেসেন্টেরন
  - প্রোক্টোডিয়াম
    - ১. ইলিয়াম
    - ২. কোলন
    - ৩. রেকটাম
    - ৪. পায়ুছিদ্র
- পৌষ্টিকগ্রন্থি
  - লালাগ্রন্থি
  - মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ
  - হেপাটিক সিকা

নিচে ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal)

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং **মুখছিদ্র** থেকে **পায়ুছিদ্র** পর্যন্ত দেহের মধ্যরেখা বরাবর সোজা নালি হিসেবে অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য পৌষ্টিকনালিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে : **স্টোমোডিয়াম, মেসেন্টেরন** ও **প্রোক্টোডিয়াম**।

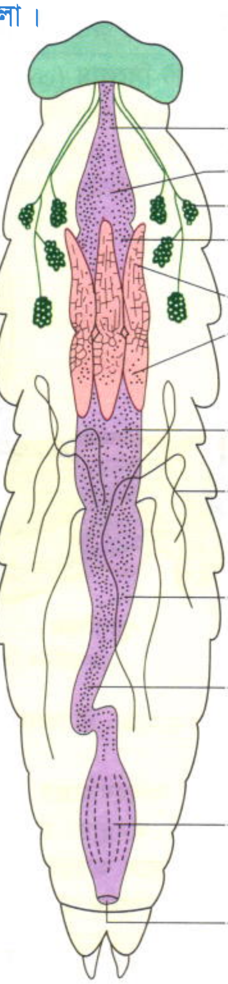

চিত্র ২.২.১০ : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (পৃষ্ঠদৃশ্য)

১. স্টোমোডিয়াম বা অগ্র-পৌষ্টিকনালি (Stomodaeum or Foregut) : এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ অংশটির অন্তঃপ্রাচীর **কাইটিন** (chitin) নির্মিত শক্ত আবরণে আবৃত। এটি প্রধানত নিচে উল্লেখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. মুখছিদ্র (Mouth) : এটি প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা **সিবেরিয়াম** (cibarium) নামক প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রবিশেষ। প্রকোষ্ঠটি মুখোপাঙ্গে বেষ্টিত।

কাজ : সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্র পথে খাদ্য দেহে প্রবেশ করে।

খ. গলবিল (Pharynx) : মুখছিদ্রটি ছোট নলাকার ও পেশিবহুল গলবিলে উন্মুক্ত।

কাজ: এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

গ. গ্রাসনালি (Oesophagus) বা অন্ননালি : এটি গলবিলের পিছনে সরু, সোজা, নলাকার পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নালি।

কাজ : খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

ঘ. ক্রপ (Crop) : গ্রাসনালি পশ্চাৎদিকে ক্রমশ স্ফীত হয়ে মোচাকার থলির মতো ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত **ক্রপ** গঠন করে। এর প্রাচীর পাতলা হলেও পেশিবহুল।

কাজ : (i) খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে। (ii) ক্রপের সংকোচন প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয়। (iii) লালার এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

ঙ. গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus): ক্রপ একটি ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে গিজার্ডে উন্মুক্ত হয়। এটি বেশ শক্ত, পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট এবং অন্তঃপ্রাচীরের কাইটিনময় ছটি দাঁত ও ছটি অনুলম্ব ভাঁজ নিয়ে গঠিত অংশ। দাঁতের পিছনে চুল ও ছটি প্যাড থাকে। এর পরের অংশে থাকে পিছনে প্রসারিত কপাটিকা। গিজার্ডের প্রাচীর বেশ পুরু থাকায় ভিতরের গহ্বর সংকীর্ণ হয়ে থাকে।

কাজ : (i) গিজার্ডের দৃঢ় সঙ্কোচন-প্রসারণ খাদ্যকে চূর্ণ করে। (ii) প্যাডের চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশের সময় ছাঁকনির কাজ করে। (iii) কপাটিকাগুলো খাদ্যকে বিপরীতে আসতে বাধা দেয়।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালি বা পাকস্থলি (Mesenteron or Midgut) : গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে উদরের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি **মেসেন্টেরন**। এটি ভ্রূণীয় এন্ডোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং

এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলের পরিবর্তে **পেরিট্রফিক পর্দা** (peritrophic membrane) নামক বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে **পেশির বলয়** বা **স্ফিংক্টার** (sphincter) থাকে। মেসেন্টেরন এবং স্টোমোডিয়ামের সংযোগস্থলে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা মোচাকার থলি থাকে। সেগুলো হচ্ছে **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (gastric caeca) বা **হেপাটিক সিকা** (hepatic caeca)। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার অন্তঃত্বকীয় কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ হয়ে অসংখ্য **ভিলাই** (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো এবং হলদে বর্ণের অঙ্গাণু থাকে। এগুলো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubules) যা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

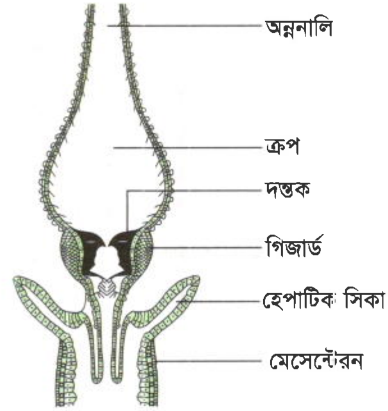

চিত্র ২.২.১১ : স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরনের লম্বচ্ছেদ

কাজ : মেসেন্টেরনের গহ্বর (lumen)-এ খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে অবস্থিত **ভিলাই** (villi) খাদ্যরস শোষণ করে।

৩. প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালি (Proctodaeum or Hindgut) : এটি পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ যা ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এবং অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলে আবৃত। নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে প্রোক্টোডিয়াম গঠিত। DAT-2016-17

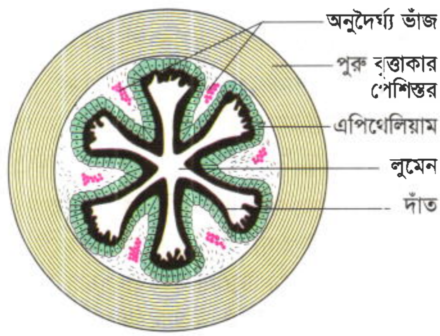

চিত্র ২.২.১২ : গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

ক. ইলিয়াম (Iluem) : এটি প্যাঁচবিহীন, চওড়া নলাকার প্রথম অংশ।

কাজ : এর প্রাচীরের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষিত হয়।

খ. কোলন (Colon) : এটি ইলিয়ামের পিছনে অবস্থিত সরু নলাকার অংশ।

কাজ : পাচিত খাদ্যবস্তুর বাকি অংশ পানিসহ শোষিত হয়।

গ. রেকটাম বা মলাশয় (Rectum) : এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ স্ফীত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত অংশ। এর অন্তঃস্থ প্রাচীরে ছয়টি **রেকটাল প্যাপিলা** (rectal papilla; বহুবচনে-papillae)-র অনুলম্ব ভাঁজ থাকে।

কাজ : মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করা ও অপাচ্য অংশ সাময়িক জমা রাখা এর কাজ।

চিত্র ২.২.১৩ : রেকটামের প্রস্থচ্ছেদ

ঘ. পায়ুছিদ্র (Anus) : এটি মলাশয়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথ। এটি দশম দেহখণ্ডকের অঙ্কীয়দেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : অপাচ্য অংশ **মল** (faeces) হিসেবে দেহ থেকে অপসারণ করে।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands)

ঘাসফড়িং-এর **লালাগ্রন্থি, মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ** ও **হেপাটিক সিকা** পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary Glands) : এটি ঘাসফড়িং-এর প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থি। ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র, শাখাপ্রশাখা-যুক্ত একজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। লালাগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : (i) লালাগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লালারস** (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বণে সাহায্য করে। (ii) কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা পালন করে।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণ : মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরে বেশ কিছু ক্ষরণকারী কোষ (secretary cells) আছে যা থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়।

কাজ : ক্ষরিত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

৩. হেপাটিক সিকা (Hepatic Caeca) : অগ্র ও মধ্য-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোণাকার ছয়জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে **হেপাটিক** বা **গ্যাস্ট্রিক সিকা** বলে। [MAT-2019-20]

কাজ : হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষরণকারী কোষ থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

খাদ্য, খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ পদ্ধতি

১. খাদ্য (Food) : ঘাসফড়িং সম্পূর্ণ **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ঘাস, শস্যদানা, লতা-পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের খাবারে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সমস্ত উপাদানই থাকে।

২. খাদ্য গ্রহণ (Ingestion) : ঘাসফড়িংয়ের যে মুখোপাঙ্গ তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তাই এমন খাদ্যগ্রহণকে **চর্বণ** (chewing) এবং মুখোপাঙ্গকে **চর্বণ-উপযোগী** বা **ম্যান্ডিবুলেট** (chewing or mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে।

ঘাসফড়িং প্রথমে ম্যাক্সিলারি ও ল্যাবিয়াল পাল্পের সাহায্যে খাদ্য নির্বাচন করে। অগ্রপদ, ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তু আটকে ধরে। ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলি খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কেটে চোষণ করে।

৩. পরিপাক (Digestion) : খাদ্য প্রাকমৌখিক বা প্রিওরাল প্রকোষ্ঠে (pre-oral cavity) পৌঁছার পরই লালাগ্রন্থি নিঃসৃত **লালারস**-এর সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। লালারস মিশ্রিত খাদ্য ক্রপে পৌঁছার পর খাদ্যের পরবর্তী পারিপাক সম্পন্ন হয়।

ক. ক্রপে পরিপাক : প্রিওরাল প্রকোষ্ঠ থেকে আংশিক পাচিত খাদ্যবস্তু গলবিল ও অন্ননালি পথে ক্রপে এসে জমা হলে এখানেই খাদ্য পরিপাকের সূচনা ঘটে এবং অধিকাংশ খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয়। মেসেন্টেরন থেকে **আন্ত্রিকরস** গিজার্ডের মাধ্যমে উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়ে ক্রপে পৌঁছে। লালারসের **অ্যামাইলেজ** এবং আন্ত্রিকরসের **ইনভারটেজ, মলটেজ** ও **ল্যাক্টোজ** নামক অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইমের প্রভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়। আন্ত্রিকরসের **ট্রিপসিন, প্রোটিয়েজ** ও **পেপটাইডেজ** নামক প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের প্রভাবে আমিষ জাতীয় খাদ্য অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। আন্ত্রিকরসে অবস্থিত **লাইপেজ** নামক লাইপোলাইটিক এনজাইম স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

খ. গিজার্ডে পরিপাক : ক্রপ থেকে খাদ্যবস্তু গিজার্ডে প্রবেশ করে এবং গিজার্ডের দাঁতে পিষ্ট ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অতি সূক্ষ্ম কণাসমৃদ্ধ **পেস্ট** (paste) বা মন্ডে পরিণত হয়। এ পরিপাক মন্ড গিজার্ডের সূক্ষ্ম রোমে পরিস্রুত হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে।

গ. মেসেন্টেরনে পরিপাক : মেসেন্টেরনের অন্তঃর্গাত্র এবং হেপাটিক সিকা ক্ষরণ ও শোষণতলরূপে কাজ করে। খাদ্যকণা মেসেন্টেরনে পৌঁছার পর হেপাটিক সিকা ও মেসেন্টেরন থেকে ক্ষরিত অ্যামাইলোলাইটিক (অ্যামাইলেজ, মলটেজ, ল্যাক্টেজ, ইনভার্টেজ প্রভৃতি), প্রোটিওলাইটিক (পেপটাইডেজ, প্রোটিয়েজ, ট্রিপটেজ, ট্রিপসিন প্রভৃতি) ও লাইপোলাইটিক (লাইপেজ) এনজাইমের কার্যকারিতায় খাদ্যের অপরিপাক অংশ পরিপাক হয়ে সরল ও তরল খাদ্যরসে রূপান্তরিত হয়।

৪. খাদ্যসার শোষণ (Absorption of Digested Food) : মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার প্রাচীরে বিদ্যমান শোষণকারী কোষের মাধ্যমে প্রায় সকল খাদ্যসার পরিশোষিত হয়। গ্লুকোজের অধিকাংশই হেপাটিক সিকাতে পরিশোষিত হয়।

৫. আত্মীকরণ (Assimilation) : শোষিত খাদ্যসার ঘাসফড়িং-এর হিমোসিলে প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিবাহিত হয় এবং শক্তি উৎপাদন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে।

৬. বর্জ্য নিষ্কাষণ (Egestion) : অজীর্ণ খাদ্যবস্তু কোলনের ভিতর দিয়ে মলাশয়ে পৌঁছার আগেই কোলনের প্রাচীর তা থেকে পানি, লবণ ও অজৈব আয়ন শোষণ করে নেয়। পরে কঠিন অপাচ্য বস্তু মলারূপে পায়ু পথে বাইরে নির্গত হয়।

ব্যবহারিক অংশ

ঘাসফড়িং ও আরশোলার বহিঃঅঙ্গসংস্থান পর্যবেক্ষণ

ঘাসফড়িং (Grasshopper)

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum : Arthropoda
Class : Insecta
Subclass : Pterygota
Order : Orthoptera
Family : Pyrgomorphidae
Genus : *Poekilocerus*
Species : *P. pictus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ কিউটিকলে আবৃত, **হলদে-সবুজ** রংয়ের এবং মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
২. মস্তকে একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি, ওসেলি ও অ্যান্টেনা** এবং **চর্বনক্ষম মুখোপাঙ্গ** রয়েছে।
৩. মধ্যবক্ষে একজোড়া সরু ও শক্ত এবং পশ্চাৎবক্ষে একাজাড়া বড়, চওড়া ও **ঝিল্লিময় ডানা** আছে।
৪. তিনজোড়া **সন্ধিল পদ** রয়েছে এবং উদর সরু, লম্বা ও ১১টি খন্ডকে বিভক্ত।
৫. স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর উদর ক্রমান্বয়ে সরু ও ডিম পাড়ার জন্য **ওভিপজিটর** যুক্ত।

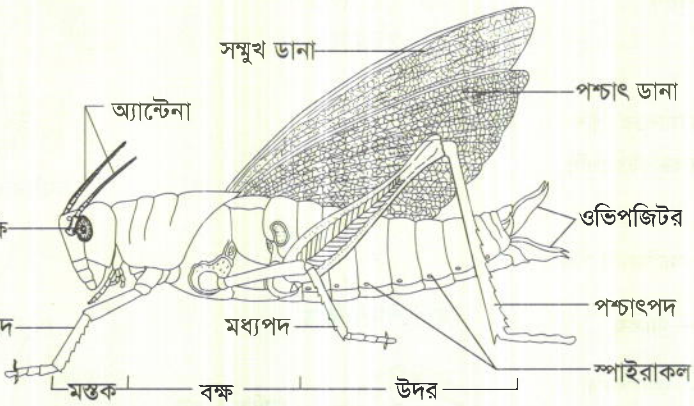

চিত্র ২.২.১৪ : *Poekilocerus pictus*

আরশোলা (Cockroach)

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum : Arthropoda
Class : Insecta
Order : Dictyoptera
Family : Blattidae
Genus : *Periplaneta*
Species : *P. americana*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরু, লম্বাটে, তেলতেলে ও লালচে বাদামী রংয়ের।
২. দেহ কিউটিকলে আবৃত ও নির্দিষ্ট খন্ডকে বিভক্ত।
৩. দেহ **মস্তক, বক্ষ** ও **উদর**-এ বিভক্ত; বক্ষে তিনটি ও উদরে ১০টি খন্ড রয়েছে।
৪. মাথায় দুটি **পুঞ্জাক্ষি**, দুটি **অ্যান্টেনা** আছে; বক্ষে **তিন জোড়া পদ** ও **দুজোড়া ডানা** রয়েছে।
৫. উদরের শেষ প্রান্তে **অ্যানাল সারকি** রয়েছে।

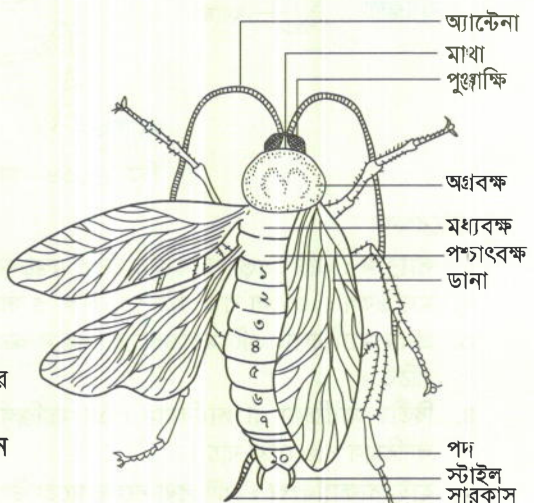

চিত্র ২.২.১৫ : *Periplaneta americana*

আরশোলা ও ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. ঘাসফড়িং বা আরশোলার মাথাটি বাম হাতের বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝে চেপে ধরে প্রথমেই বিভিন্ন উপাঙ্গ শনাক্ত করতে হবে।

২. একটি চিমটার সাহায্যে প্রত্যেক উপাঙ্গের গোড়ায় চাপ দিয়ে প্রথমে ল্যাব্রাম, পরে একে একে ম্যান্ডিবল ম্যাক্সিলা, হাইপোফ্যারিংক্স এবং সবশেষে ল্যাবিয়াম তুলে ফেলতে হবে।

৩. একটি স্লাইডে আগে থেকে রক্ষিত কিছু গ্লিসারিনে এগুলো ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্লাইডটি স্থাপন করে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের চিত্রঃ ২.২.৬

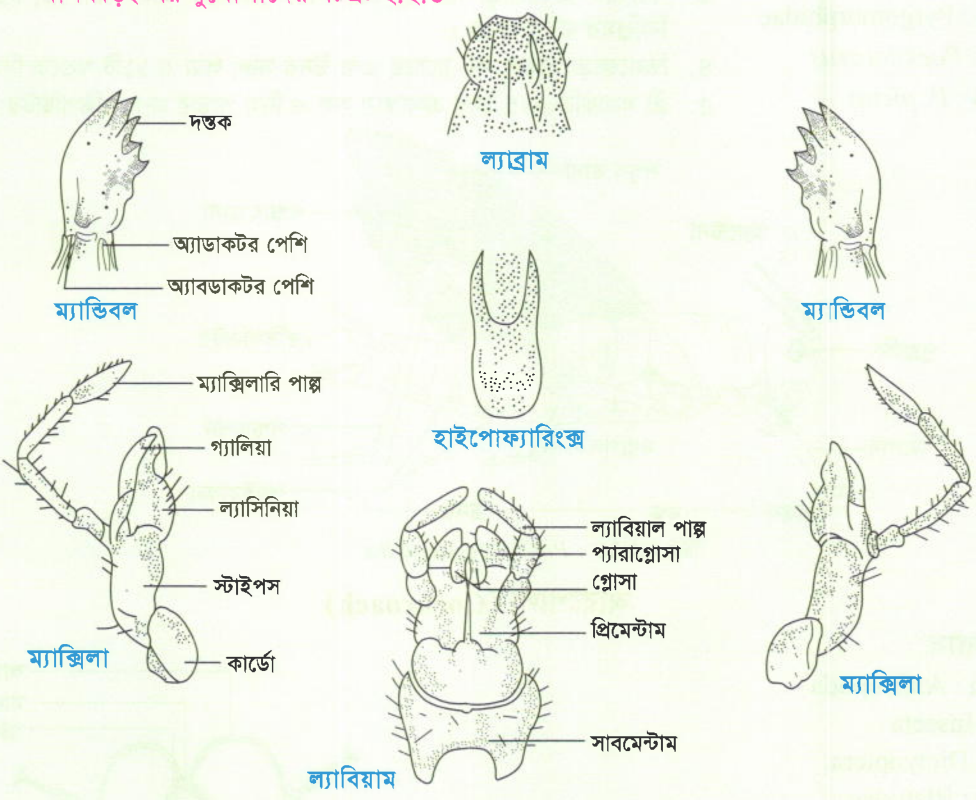

চিত্র ২.২.১৬ : আরশোলার মুখোপাঙ্গ

পর্যবেক্ষণ

১. **ল্যাব্রাম :** এটি চওড়া পাতের মতো ও মস্তকের সম্মুখে আটকানো থাকে।

২. **ম্যান্ডিবল :** এগুলো শক্ত, মজবুত, বাঁকা ও দাঁতযুক্ত।

৩. **প্রথম ম্যাক্সিলাঃ** এটি ম্যান্ডিবলের পিছনে অবস্থিত। এর গোড়ার অংশ কার্ডো, স্টাইপস ও ল্যাসিনিয়া নিয়ে গঠিত।

৪. **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা বা ল্যাবিয়াম :** ১ম ম্যাক্সিলার পিছনে অবস্থিত। সাবমেন্টাম, মেন্টাম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। ল্যাবিয়াল পাল্প দেখা যায়।

৫. **হাইপোফ্যারিংক্স :** এটি লম্বা নলের মতো উপজিহ্বা।

ঘাসফড়িং / আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

একটি সদ্যমৃত বা নিস্তেজ ঘাসফড়িং বা আরশোলার ডানা কেটে বাম হাতে ধরে বক্ষ উদরের টার্গা ও স্টার্ণা পৃথক করার জন্য দেহের দুপাশ বরাবর সূক্ষ্ম কাঁচি প্রবেশ করিয়ে কাটতে হবে। প্রাণিটিকে এখন পানিপূর্ণ ট্রেতে পিঠ উপরে রেখে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। চিমটার সাহায্যে একটির পর একটি টার্গা ছাড়াতে হবে। এভাবে বক্ষ ও উদর উন্মুক্ত করার পর ব্যবহৃত পানি ফেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হবে। পৌষ্টিকনালিকে একটু টেনে একপাশে পিন দিয়ে আটকে বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ (তত্ত্বীয় অংশে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে) করে চিত্র এঁকে চিহ্নিত করতে হবে। **ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র নং-২.২.১০।**

লালাগ্রন্থি পর্যবেক্ষণ

পৌষ্টিকনালি ব্যবচ্ছেদ করার সময় অন্ননালি পর্যন্ত বের করে ধীরে ধীরে সুচ ও চিমটার সাহায্যে চর্বি ও মাংসপেশিগুলো ছাড়াতে হবে। সাদা পাতার মতো দেখতে **লালাগ্রন্থি** দেখার সাথে সাথে লালাগ্রন্থি নালির অবস্থান লক্ষ করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উপ-জিহ্বা (হাইপোফ্যারিংক্স) পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে লালাগ্রন্থিগুলোর মাঝখানে উভয় পাশে একটি করে বেলুনের মতো যে **লালাধার** রয়েছে তা যেন ছিঁড়ে না যায়। **হাইপোফ্যারিংক্স**সহ অভিন্ন **লালাগ্রন্থি নালি, লালাগ্রন্থি** ও **লালাধার** তুলে একটি স্লাইডে রাখতে হবে। এবার স্লাইডকে সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

চিত্র ২.২.১৭ : আরশোলার লালাগ্রন্থি

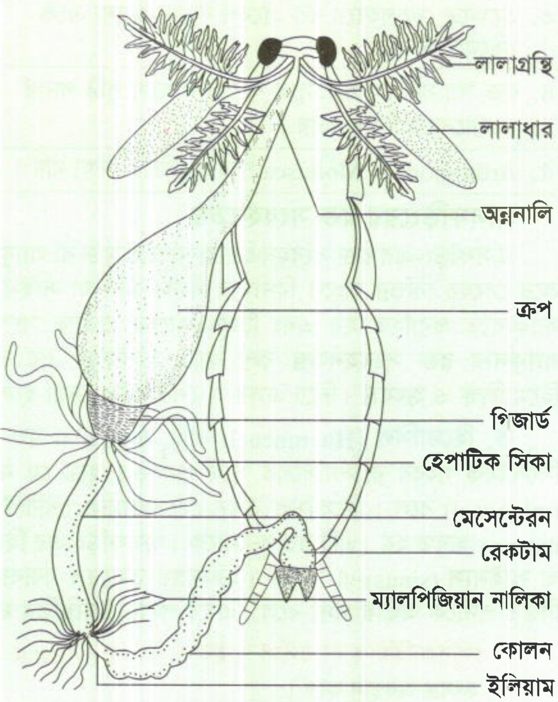

চিত্র ২.২.১৮ : আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

ঘাসফড়িং-এর দেহে রক্তরূপী হিমোলিম্ফ সংবহনের জন্য হৃৎযন্ত্ররূপী পৃষ্ঠীয় বাহিকা ও অন্যান্য বাহিকা নিয়ে গঠিত তন্ত্রকে **রক্ত সংবহনতন্ত্র** বলে। রক্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যেমন-**মুক্ত** (open) বা **ল্যাকুনার** (lacunar) এবং **বদ্ধ** (closed) সংবহনতন্ত্র।

১. **মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র (Open type circulatory system) :** যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে নালিকা পথে বেরিয়ে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে এবং দেহগহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃৎযন্ত্রে ফিরে আসে তার নাম **মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র** বলে। অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণিদের দেহে এ ধরনের সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।

২. **বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র (Closed type circulatory system) :** যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে **বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র** বলে। Annelida পর্বের ননকর্ডেট প্রাণিদেহে এবং কর্ডেট প্রাণীতে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

মুক্ত ও বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র	বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র
১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র, রক্তবাহিকা ও বিভিন্ন সাইনাসে অবস্থান করে।	১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র ও রক্তবাহিকার ভিতরে অবস্থান করে।
২. হৃৎযন্ত্র, সংক্ষিপ্ত রক্তনালি ও সাইনাস নিয়ে এটি গঠিত।	২. হৃৎযন্ত্র, শিরা, ধমনি ও কৈশিকজালিকা সমন্বয়ে এটি গঠিত।
৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে; এজন্য একে হিমোসিল বলে।	৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে না।
৪. রক্ত সরাসরি কোষ-টিস্যুর সংস্পর্শে এসে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটায়।	৪. রক্ত কোষ-টিস্যুর সরাসরি সংস্পর্শে আসে না। টিস্যুরসের মাধ্যমে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটে।
৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।	৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও মুক্ত বা ল্যাকুনার ধরনের। এদের রক্তনালিগুলো কৈশিকজালিকা গঠন না করে দেহের বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান ফাঁকা স্থান বা **সাইনাস** বা **ল্যাকুনাতে** মুক্ত হয়। ফলে রক্ত ঐ সব গহ্বর বা ল্যাকুনাতে প্রবাহিত হয় এবং টিস্যু-কোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এজন্য এদের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে **মুক্ত** বা **ল্যাকুনার রক্ত সংবহনতন্ত্র** বলা হয়। ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত-**হিমোসিল, হিমোলিম্ফ ও হৃৎযন্ত্র**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো। [MAT-2017-18]

ক. **হিমোসিল (Haemocoel;** গ্রিক, *haima* = রক্ত + *koiloma* = গহ্বর) **:** ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় প্রধান সিলোমিক গহ্বর ব্লাস্টোসিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে নতুন গহ্বরের সৃষ্টি করে তাকে **হিমোসিল** বা **মিক্সোসিল** (mixocoel) বলে। হিমোসিল তখন মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামের পরিবর্তে বহিঃকোষীয় মাতৃকায় (extra cellular matrix) আবৃত হয়। এটি রক্তপূর্ণ থাকে। ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুপ্রস্থ পর্দা (diaphragm) দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা **সাইনাস** (sinus)-এ বিভক্ত। হৃৎযন্ত্রের তলদেশ বরাবর অবস্থিত পর্দাকে **পৃষ্ঠীয় পর্দা** এবং স্নায়ুরজ্জুর ঠিক উপরে বিস্তৃত পর্দাকে **অঙ্কীয় পর্দা** বলে। এসব পর্দার উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সাইনাস-তিনটি নিম্নরূপ–

i. **পেরিকার্ডিয়াল বা ডর্সাল সাইনাস (Pericardial or Dorsal sinus) :** এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার ঠিক উপরে অবস্থিত। এতে হৃৎযন্ত্র অবস্থান করে।

ii. **পেরিভিসেরাল সাইনাস (Perivisceral sinus) :** এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার নিচে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকনালিকে ধারণ করে।

iii. **পেরিনিউরাল বা স্টার্নাল সাইনাস (Perineural or Sternal sinus) :** এটি অঙ্কীয় পর্দার নিচে অবস্থিত গহ্বর। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত প্রয়োজন মতো এক সাইনাস থেকে অন্য সাইনাসে যাতায়াত করতে পারে। অঙ্কীয় পর্দাটি পায়ের ভিতরেও বিস্তৃত।

কাজ : হিমোসিল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে। এর মাধ্যমে খাদ্যরস ও বর্জ্যবস্তু পরিবাহিত হয়।

খ. হিমোলিম্ফ বা রক্ত (Haemolymph or Blood) : ঘাসফড়িংয়ের রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরে লসিকার (lymph) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে একে হিমোলিম্ফ বলে। এটি অসংখ্য ও নানা ধরনের কোষ, জৈব ও অজৈব পদার্থবাহী তরল বিশেষ। ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিম্ফ বর্ণহীন কারণ এতে হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক থাকেনা।

চিত্র ২.২.১৯ : ঘাসফড়িং-এর বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

এর p^H ৬-৭ অর্থাৎ সামান্য আম্লিক; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০১-১.০৬। হিমোলিম্ফ দুটি উপাদানে গঠিত, যথা–**হিমোলিম্ফ রস** বা **প্লাজমা** এবং **হিমোসাইট**।

১. হিমোলিম্ফ রস বা প্লাজমা (Plasma) : প্লাজমার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি। এ রসে প্রায় সব ধরনের জৈব ও অজৈব উপাদান দ্রবীভূত বা ভাসমান থাকে; যেমন– (i) বিভিন্ন আয়ন; (ii) আমিষ ও মুক্ত অ্যামিনো এসিড; (iii) ফসফোলিপিড, স্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য; (iv) ট্রেহালোজরূপী (দুই অণু গ্লুকোজ) সরল শর্করা; (v) প্রধানত সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালিসিয়ামের লবণ; (vi) জৈব অম্ল; (vii) এস্টার; (viii) ফসফেট; (ix) ইউরিক এসিড; (x) রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি।

ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিম্ফ রস আর স্তন্যপায়ীর **রক্তরস** এক নয়, কারণ হিমোলিম্ফ রসে থাকে– (i) অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ অ্যামিনো-নাইট্রোজেন উপাদান; (ii) নিম্ন সোডিয়াম–পটাসিয়াম অনুপাত; (iii) বেশি ইউরিক এসিড; (iv) প্রধান শর্করারূপে ট্রেহালোজ; এবং (v) প্রধান লিপিডরূপে লিপোপ্রোটিন যৌগ নির্মাণকারী ডাইগ্লিসারাইড।

২. হিমোসাইট (Haemocytes) বা রক্তকণিকা : ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিম্ফে বেশ কয়েক ধরনের মেসোডার্ম উদ্ভূত, অ্যামিবয়েড ও নিউক্লিয়াসধারী **হিমোসাইট** ভাসমান থাকে। এরা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্বেত রক্তকণিকার সমসংস্থ এবং হিমোসিলের সবখানে সংবহিত হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার হিমোলিম্ফে হিমোসাইটের সংখ্যা ১৫,০০০ - ৬০,০০০।

ঘাসফড়িংয়ের হিমোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের–

i. প্রাকহিমোসাইট বা প্রোহিমোসাইট (Pro Haemocyte) : এদের আয়তন ৬μm - ৯μm. মোট হিমোসাইটের ২৩ ভাগ প্রাকহিমোসাইট।

ii. পরিবর্তনীয় বা ট্রানজিশনাল হিমোসাইট (Transitional Haemocyte) : এদের আয়তন ৯μm - ১৮μm এবং সংখ্যা ৬৮%।

iii. বড় হিমোসাইট (Large Haemocyte) : এদের আয়তন ১৮μm - ২৩μm এবং সংখ্যা ৯%।

হিমোসাইটগুলো প্রাথমিকভাবে দেহগহ্বরের বিভিন্ন কঠিন পদার্থ **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে দেহ থেকে মুক্ত করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং খোলস বদলের পরই এ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কোনো ক্ষতস্থানেও হিমোসাইটিগুলো একত্রিত হয়ে ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে।

রক্তের কাজ: ঘাসফড়িং রক্তের মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে, যেমন– (i) এটি পানির আধার হিসেবে কাজ করে এবং খাদ্যসার, রেচন পদার্থ, হরমোন ও খনিজ লবণ পরিবহন করে। (ii) কিছু পরিমাণ CO_2 রক্তে দ্রবীভূত হয়ে বাহিত হয়। (iii) বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। (iv) রক্তরসে সঞ্চিত পানি কোষীয় তরলের অভিস্রবণিক চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। (v) রক্তের হিমোসাইটগুলো বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংস করে। (vi) তঞ্চনে ও ক্ষত নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। (vii) রক্ত ডানার সঞ্চালন ও খোলস মোচনে সাহায্য করে।

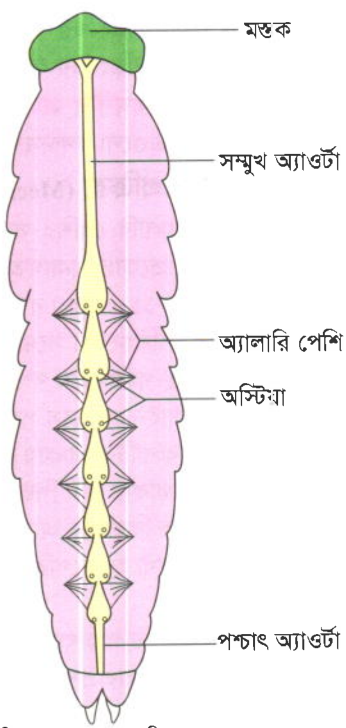

চিত্র ২.২.২০ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র

গ. হৃৎযন্ত্র (Heart) : ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্র নলাকার এবং **৭টি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট**। এটি দেহের মধ্য-পৃষ্ঠ রেখা বরাবর পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে মস্তক থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। হৃৎযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলো ফানেলাকার এবং লম্বালম্বি এক সারিতে বিন্যস্ত। এদের পশ্চাৎ অংশ চওড়া এবং সম্মুখ অংশ ক্রমশ সরু। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ তার সরু অংশ দিয়ে অগ্রবর্তী প্রকোষ্ঠের চওড়া অংশের সাথে যুক্ত থাকে। সংযুক্ত স্থানের উভয় পাশে একটি করে **অস্টিয়া** (ostia) নামক ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্র দিয়ে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সরু প্রান্তের শীর্ষে একটি ছিদ্র থাকে। হৃৎযন্ত্রের সকল প্রকোষ্ঠের ছিদ্র **অন্তর্বাহী কপাটিকা** দিয়ে সুরক্ষিত থাকায় হৃৎযন্ত্রের একমুখী রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রথম প্রকোষ্ঠটির সম্মুখভাগ ক্রমশ সরু হয়ে একটি সোজা নলাকার অংশ গঠন করে। এর নাম **সম্মুখ অ্যাওর্টা**। এটি মস্তকের সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। হৃৎযন্ত্রের শেষ প্রকোষ্ঠটির পশ্চাৎভাগ থেকে সৃষ্ট সরু, সোজা নলাকার অংশটি **পশ্চাৎ অ্যাওর্টা**। টার্গামের অঙ্কীয় তলের দুপাশ থেকে **অ্যালারি পেশি** (alary muscle) নামক ত্রিকোণা পাখার মতো বিশেষ ধরনের পেশি উৎপন্ন হয়ে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের প্রাচীরে যুক্ত হয় এবং হৃৎযন্ত্রের পার্শ্ব-অঙ্কীয়দেশেও যুক্ত থাকে। ঘাসফড়িংয়ে ছয়জোড়া অ্যালারি পেশি পাওয়া যায়। এদের সঙ্কোচন-প্রসারণ রক্ত সংবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হৃৎযন্ত্রের প্রাচীরে হৃৎপেশি-টিস্যু এবং পেসমেকার থাকে না। তাই **হৃৎবিভব** (cardiac impulse) হৃৎপ্রাচীরে সৃষ্টি না হয়ে হৃৎযন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থিত কোনো **গ্যাংগ্লিওন** বা **স্নায়ুগ্রন্থি** দিয়ে সৃষ্টি হয়। এ ধরনের হৃৎযন্ত্রকে **নিউরোজেনিক হার্ট** (neurogenic heart) বলে। সকল পতঙ্গে এ ধরনের হৃৎযন্ত্র থাকে। ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রের প্রাচীরে হৃৎপেশি না থাকায় এবং হৃৎযন্ত্রের গঠন রক্তনালির মতো হওয়ায় (পিন্ডাকার নয়) ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রকে **হৃৎপিণ্ড** বলা হয় না।

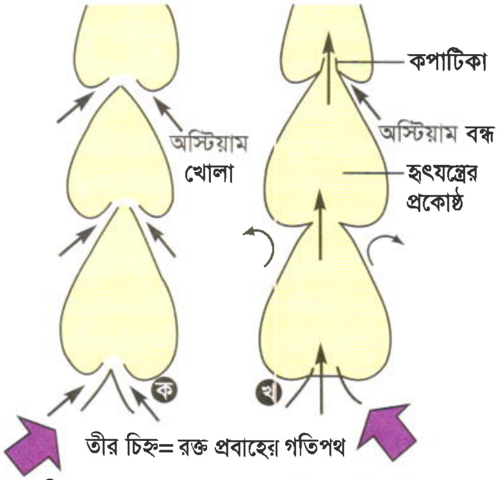

চিত্র ২.২.২১ : হৃৎযন্ত্রের আংশিক বর্ধিত চিত্র
(ক=হৃৎযন্ত্রের প্রসারণ; খ=হৃৎযন্ত্রের সঙ্কোচন)

আনুষঙ্গিক স্পন্দনশীল অঙ্গ : ঘাসফড়িংয়ের অ্যান্টেনা, পদ ও ডানার গোড়ায় নানা আকৃতির পেশিযুক্ত ঝিল্লির মতো অঙ্গ থাকে। এগুলো স্পন্দনশীল। এদের সঙ্কোচন প্রসারণে রক্ত সাইনাস থেকে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবেশ করে।

রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood Circulation)

হৃৎযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলেই ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১১০ বার। রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয়।

১. অ্যালারি পেশিগুলোর সঙ্কোচনে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে।
২. পরে হৃৎযন্ত্র পর্যায়ক্রমে পশ্চাৎ থেকে সম্মুখে সঙ্কুচিত হওয়ায় রক্ত সম্মুখদিকে প্রবাহিত হয় এবং অ্যাওর্টার মাধ্যমে মস্তকের সাইনাসে এসে পড়ে।
৩. অস্টিয়ায় কপাটিকা থাকায় রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে বাইরে আসতে পারে না এবং হৃৎযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকায় রক্ত পিছন দিকে যেতে পারে না।
৪. মস্তক থেকে কিছু রক্ত অ্যান্টেনায় প্রবেশ করে।
৫. রক্ত পশ্চাৎমুখী হয়ে পেরিনিউরাল সাইনাসে চলে আসে। পেরিনিউরাল সাইনাস থেকে রক্ত পদ ও ডানায় প্রবেশ করে।
৬. রক্ত পরবর্তীতে পশ্চাৎমুখী হয়ে পেরিভিসেরাল সাইনাসে প্রবেশ করে।
৭. হৃৎযন্ত্র যখন আবার প্রসারিত হয় তখন পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে ফিরে আসে।
৮. পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে অ্যালারি পেশিগুলোর সঙ্কোচনে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে পুনরায় হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ঘাসফড়িংয়ের সমগ্র দেহে একবার রক্ত প্রবাহ সম্পন্ন করতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।

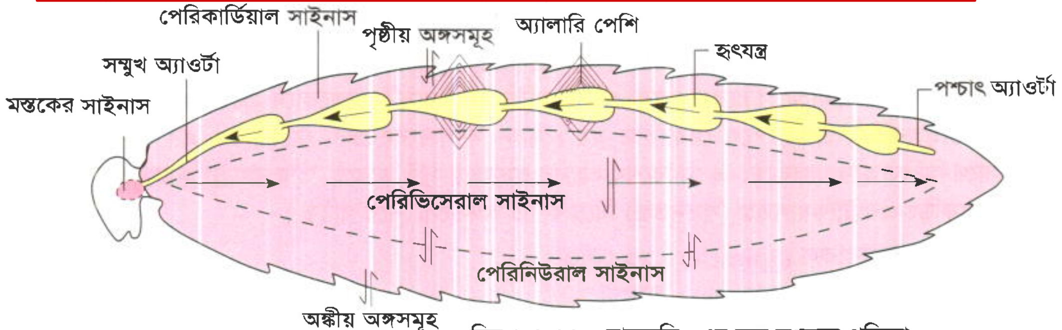

চিত্র ২.২.২২ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত প্রবাহের ছক নিচে দেওয়া হলো–

পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস (হিমোসিল) → হৃৎযন্ত্রের প্রসারণ → হৃৎযন্ত্র → হৃৎযন্ত্রের সঙ্কোচন
↓
সম্মুখ অ্যাওর্টা → মস্তকের সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিনিউরাল সাইনাস (হিমোসিল)
↑
পেরিনিউরাল সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিভিসেরাল সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস (হিমোসিল)

চিত্র ২.২.২৩ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত প্রবাহের গতিপথ

সিলোম ও হিমোসিল-এর মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	হিমোসিল
১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণে পরিবৃত দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী সিলোমিক রসপূর্ণ গহ্বর।	১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণবিহীন দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী রক্তপূর্ণ গহ্বর।
২. সিলোম দেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গে প্রসারিত হয় না।	২. হিমোসিল দেহের সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়।
৩. সিলোম রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে না।	৩. হিমোসিল রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে।
৪. সিলোমে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না।	৪. হিমোসিলে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে সিলোম পাওয়া যায়।	৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে হিমোসিল পাওয়া যায়।

ঘাসফড়িং ও মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র	মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র
১. ধরন	মুক্ত ধরনের সংবহনতন্ত্র।	বদ্ধ ধরনের সংবহনতন্ত্র।
২. রক্তের বর্ণ	রক্ত বর্ণহীন কারণ এতে হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক থাকে না।	রক্ত কণিকায় (RBC) হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত লাল বর্ণের।
৩. রক্তের উপাদান	বর্ণহীন প্লাজমায় শ্বেতরক্তকণিকা ভাসমান থাকে।	বর্ণহীন প্লাজমায় তিন ধরনের রক্তকণিকা ভাসমান থাকে।
৪. হৃৎযন্ত্র	নলাকার; সাত প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; প্রাচীর হৃৎপেশিবিহীন।	পিন্ডাকার; চার প্রকোষ্ঠী; প্রাচীর হৃৎপেশি দিয়ে গঠিত।
৫. অ্যালারি পেশি	হৃৎযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের পার্শ্বভাগে একজোড়া করে বিদ্যমান।	অনুপস্থিত।
৬. হিমোসিল	রক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে হিমোসিল গঠন করে।	রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকায় আবদ্ধ থাকে এবং কোনো হিমোসিল গঠন করে না।

ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)

অন্যান্য স্থলচর পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংও শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদের শ্বসনতন্ত্র বেশ উন্নত হওয়ায় রক্তের অক্সিজেন বহনে অক্ষমতার ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয়েছে। **ট্রাকিয়া** নামক এক ধরনের সূক্ষ্ম শ্বাসনালির শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন সরাসরি দেহকোষে প্রবেশ করে এবং দেহকোষে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড একই পথে দেহনির্গত হয়। শ্বসন সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও এর শাখা-প্রশাখাগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ঘাসফড়িং-এ যে বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তার নাম **ট্রাকিয়ালতন্ত্র** (trachaeal system)। ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (শ্বসনতন্ত্র) নিচে বর্ণিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. **শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) :** ১০ জোড়া
২. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Tracheae) :** অসংখ্য
৩. **বায়ুথলি (Air Sac) :** অসংখ্য
৪. **প্রান্তীয় কোষ বা ট্রাকিওল কোষ (Tracheole cell) :** অসংখ্য
৫. **ট্রাকিওল (Tracheole) :** অসংখ্য

চিত্র ২.২.২৪ : একটি স্পাইরাকল

নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : এগুলো ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্মুক্ত ছিদ্রপথ। দেহের উভয় পাশে মোট **দশজোড়া শ্বাসরন্ধ্র** বা **স্পাইরাকল** রয়েছে। এর মধ্যে **দুজোড়া বক্ষীয় অঞ্চলে** এবং **আটজোড়া উদরীয় অঞ্চলে** অবস্থিত। শ্বাসরন্ধ্রগুলোর এ ধরনের বিন্যাসের কারণে ঘাসফড়িংয়ের শ্বসনতন্ত্রকে **হলোনিউস্টিক ট্রাকিয়াল তন্ত্র** (holopneustic tracheal system) বলে। প্রত্যেক স্পাইরাকল ডিম্বাকার ছিদ্রবিশেষ এবং **পেরিট্রিম** (peritreme) নামক **কাইটিন**নির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকে। রন্ধ্রগুলোর মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত **পরিস্রাবণ** বা **ছাঁকনি যন্ত্র** (filtering apparatus) থাকায় ধূলাবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। পেশি নিয়ন্ত্রিত **কপাটিকা**র সাহায্যে রন্ধ্রগুলো খোলে বা বন্ধ হয়। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ থাকলে দেহ থেকে জলীয় বাষ্প বেরোতে পারে না। বক্ষ অঞ্চলের স্পাইরাকলগুলো সরাসরি ট্রাকিয়ায় মুক্ত হয়। কিন্তু উদরের স্পাইরাকলগুলো ট্রাকিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বে **অ্যাট্রিয়াল প্রকোষ্ঠ** (atrial chamber) নামক একটি গহবরে মুক্ত হয়। অ্যাট্রিয়াল প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত এধরনের শ্বাসরন্ধ্রকে **অ্যাট্রিয়াল স্পাইরাকল** (atrial spiracle) বলে।

কাজ : (i) স্পাইরাকল দিয়ে দেহে বায়ু প্রবেশ করে। (ii) এরা ধুলোবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদির প্রবেশ রোধ করে।

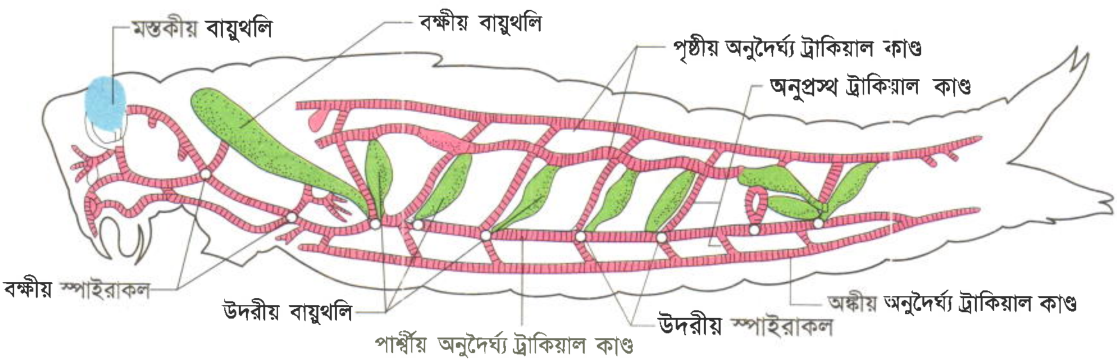

চিত্র ২.২.২৫ : ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

২. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Tracheae) : প্রতিটি স্পাইরাকল **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত। এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, স্থিতিস্থাপক, প্রায় ২.৫ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাসবিশিষ্ট বহিঃত্বকীয় (ectodermal) **ট্রাকিয়া** যা ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ এবং সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত। ট্রাকিয়া ত্বকের অন্তঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদের প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট। বাইরের এপিডার্মিস গঠিত **ভিত্তিঝিল্লি**

(basement membrane), মাঝখানে চাপা বহুভুজাকার কোষে গঠিত **এপিথেলিয়াম** (epithelium) এবং ভিতরের কিউটিকল নির্মিত **ইন্টিমা** (intima)।

ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এ গহ্বরে কিছুটা পরপর ইন্টিমা পুরু হয়ে আংটির মতো বলয় গঠন করে। এগুলোর নাম **টিনিডিয়া** (ctenidia)। বাতাসের চাপ কমে গেলে টিনিডিয়া ট্রাকিয়াকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। একই সাথে টিনিডিয়া ট্রাকিয়ায় অতিরিক্ত বাতাস প্রবেশের ফলে বাতাসের চাপের বৃদ্ধিজনিত অতি প্রসারণ থেকে ট্রাকিয়াকে রক্ষা করে। দেহে ট্রাকিয়া জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও প্রধান কয়েকটি নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বিন্যস্ত থাকে। এগুলোকে **ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (tracheal trunk) বলে। মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে। যেমন–

- দেহের দুপাশে অবস্থিত একজোড়া **পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (lateral longitudinal tracheal trunk),
- হৃৎযন্ত্রের দুপাশে অবস্থিত একজোড়া **পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (dorsal longitudinal tracheal trunk) এবং
- স্নায়ুরজ্জুর দুপাশে অবস্থিত একজোড়া **অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (ventral longitudinal tracheal trunk)।

দেহের প্রতিপাশে অবস্থিত পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় কতগুলো **অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (transeverse tracheal trunk) সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ডকে যুক্ত করে।

কাজ: ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহন করে।

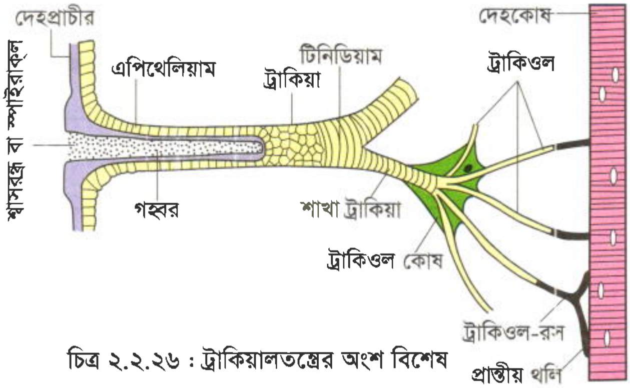

চিত্র ২.২.২৬ : ট্রাকিয়ালতন্ত্রের অংশ বিশেষ

৩. বায়ুথলি (Air sac) : ঘাসফড়িংয়ের শ্বসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো– বিভিন্ন স্থানে ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড়, ইন্টিমাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত **বায়ুথলি** গঠন করে। এগুলো মস্তক, বক্ষ ও উদর অঞ্চলে অবস্থান করে।

কাজ: (i) বায়ুথলিগুলো অতিরিক্ত বায়ু ধরে রাখে। (ii) শ্বসনের সময় উদরের সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এরা ট্রাকিয়ালতন্ত্রে বায়ু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

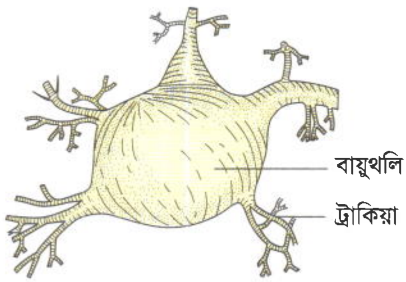

চিত্র ২.২.২৭ : একটি বায়ুথলি

৪. ট্রাকিওল কোষ বা প্রান্তীয় কোষ (Tracheole cell) : প্রধান ট্রাকিয়াগুলোর পার্শ্বভাগ থেকে ক্রমাগত বিভাজনের ফলে **শাখা ট্রাকিয়া** উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক সূক্ষ্ম শাখা ট্রাকিয়া একটি তারকাকার **ট্রাকিওল কোষ** বা **প্রান্তীয় কোষ**-এ পরিসমাপ্তি ঘটায়। ট্রাকিওল কোষ অন্যান্য প্রাণিকোষের মতো পাতলা কোষীয় পর্দা, একটি বড় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম যুক্ত।

কাজ : ট্রাকিওল নামক নালি সৃষ্টি করে দেহকোষ ও ট্রাকিয়া মধ্যস্থ গ্যাসের আদান-প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. ট্রাকিওল (Tracheole) : ট্রাকিওল কোষ থেকে সৃষ্ট ট্রাকিয়া অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ১ মাইক্রোমিটার-এরও কম (0.2μm –0.3μm) ব্যাসবিশিষ্ট প্রচুর সংখ্যক জালিকাকারে বিস্তৃত শাখাকে **ট্রাকিওল** বলে। এদের প্রাচীর কাইটিন ও ইন্টিমাবিহীন এবং প্রত্যেক শাখার শেষ প্রান্তে তরলে পূর্ণ লম্বা থলি বা **প্রান্তীয় থলি** থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এগুলো সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসে।

কাজ : ট্রাকিওল থেকে প্রান্তীয় থলির তরলে O_2 দ্রবীভূত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহকোষে প্রবেশ করে এবং দেহকোষ থেকে CO_2 দ্রবীভূত হয়ে ট্রাকিওলে ফিরে আসে।

ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	ট্রাকিয়া	ট্রাকিওল
১. আকার-আকৃতি	শাখা-প্রশাখাযুক্ত বড় ব্যাসবিশিষ্ট নালি; ব্যাস প্রায় ২.৫μm।	শাখা-প্রশাখাবিহীন সূক্ষ্ম নালি; ব্যাস ১μm-এর কম (0.২μm –0.৩μm)।
২. গঠন	অন্তঃপ্রাচীরে **ইন্টিমা** থাকায় বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায় না।	অন্তঃপ্রাচীর ইন্টিমাবিহীন, বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায়।
৩. অবস্থান	হিমোসিলে অবস্থিত।	দেহকোষের নিবিড় সান্নিধ্যে অবস্থান করে।
৪. বর্ণ	রূপার মতো চকচকে।	সাদাটে।
৫. অভ্যন্তর ভাগ	বায়ুপূর্ণ থাকে।	তরলে পূর্ণ থাকে।
৬. উৎপত্তি	অ্যাট্রিয়াম থেকে উৎপন্ন হয়।	ট্রাকিওল কোষ থেকে উৎপন্ন হয়।
৭. পরিসমাপ্তি	ট্রাকিওল কোষে পরিসমাপ্ত।	দেহকোষে পরিসমাপ্ত।
৮. দেহকোষের সাথে সম্পর্ক	দেহকোষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থাকে না।	দেহকোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।
৯. কাজ	স্পাইরাকল থেকে ট্রাকিওল পর্যন্ত O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটায়।	ট্রাকিওল কোষ থেকে দেহকোষ পর্যন্ত ব্যাপন প্রক্রিয়ায় O_2 ও CO_2 -এর বিনিময়ে সাহায্য করে।

শ্বসন পদ্ধতি (Process of Respiration)

শ্বাসরঞ্জক না থাকায় ঘাসফড়িং-এর রক্ত শ্বসনে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জালিকার মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় প্রক্রিয়া প্রধানত শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশির কার্যকারিতায় উদরের ছন্দময় সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে বায়ু (O_2) দেহে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিয়ালতন্ত্র থেকে বায়ু (CO_2) বেরিয়ে আসে।

ক. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : পেশির প্রসারণে উদরীয় খণ্ডকগুলো প্রসারিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রথম চারজোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ **প্রশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্র**গুলো (inhalatory spiracle) খুলে যায় ফলে O_2-যুক্ত বায়ু প্রথমে শ্বাসরন্ধ্রের মাধ্যমে ট্রাকিয়ায় পৌঁছে, পরে সেখান থেকে ট্রাকিওল (টিস্যুরসে দ্রবীভূত হয়) ও বায়ুথলির মাধ্যমে অন্তঃকোষীয় স্থানে পৌঁছায়।

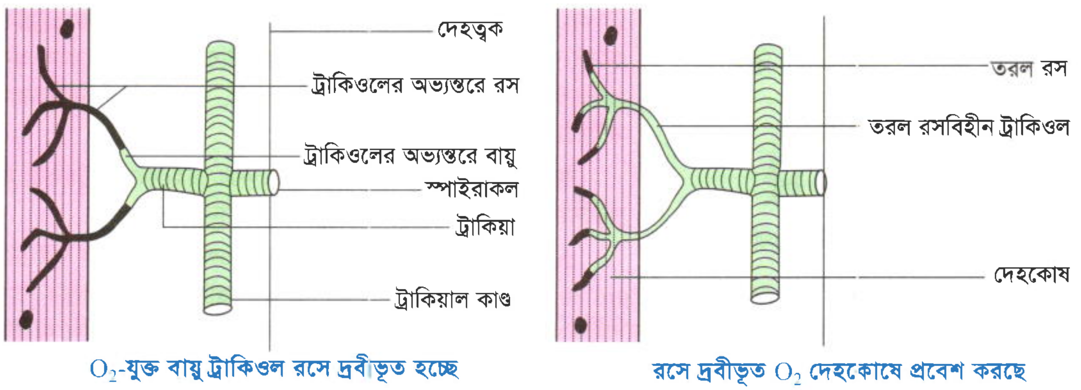

চিত্র ২.২.২৮ : ঘাসফড়িংয়ের শ্বসন কৌশল (বায়ে-শ্বাসগ্রহণ; ডানে–শ্বাসত্যাগ)

খ) শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : কোষীয় শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ট্রাকিওল রসে আসে এবং সেখান থেকে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। বক্ষীয় ও উদরীয় পেশির সঙ্কোচনের ফলে দেহ খণ্ডকগুলোর সঙ্কোচন ঘটে এবং সাথে সাথে ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরের আয়তন হ্রাস পায়। এসময় বাকি ছয় জোড়া শ্বাসরন্ধ্র খুলে যায় যার মধ্য দিয়ে ট্রাকিয়া থেকে CO_2-সমৃদ্ধ বায়ু দ্রুত বেরিয়ে যায়। কোষে উৎপন্ন CO_2-এর অল্প কিছু অংশ রক্তের প্লাজমায় পরিবাহিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহতল দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়।

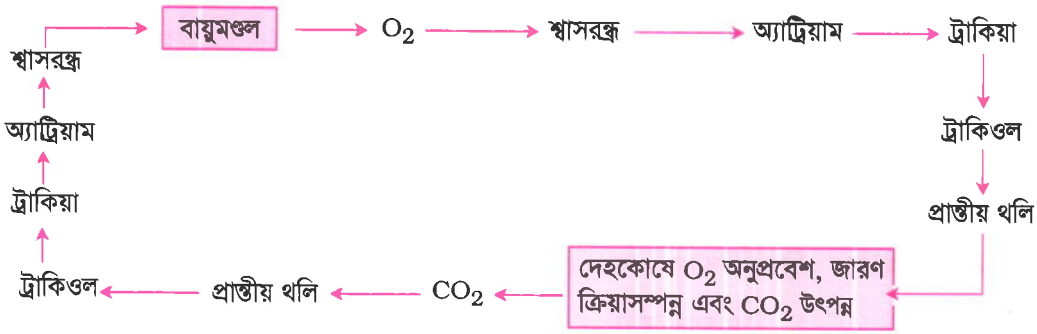

চিত্র ২.২.২৯ : শ্বসনের গতিপথের রেখাচিত্র

ঘাসফড়িং-এর রেচন তন্ত্র (Excretory System)

আমিষজাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে রেচন (excretion) **বলে।** অন্যসব পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গও **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule)। তবে মেদপুঞ্জের কিছু কোষ অর্থাৎ **ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ গ্রন্থি, নেফ্রোসাইট** এবং **কিউটিকল** অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা

নামকরণ : Marcello Malpighi (1628–1694) নামক এক ইতালীয় চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ১৬৬৯ সালে এ নালিকা আবিষ্কার করলে তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

অবস্থান : মেসেন্টেরন ও ইলিয়ামের সংযোগস্থলে অসংখ্য (প্রায় ১০০টি) সুতার মতো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** হিমোসিলে বিস্তৃত থাকে। এগুলোর মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোলিম্ফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। অন্যপ্রান্ত পৌষ্টিকনালির গহ্বরে উন্মুক্ত।

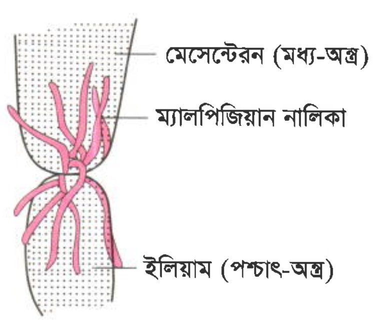

চিত্র ২.২.৩০ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার অবস্থান

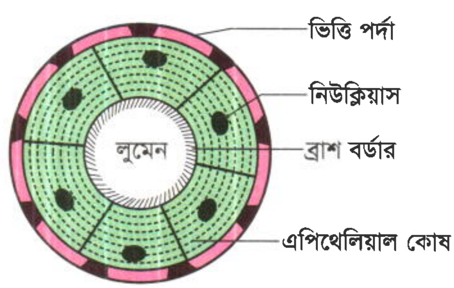

চিত্র ২.২.৩১ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার প্রস্থচ্ছেদ

গঠন : প্রত্যেক ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা, এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত, সরু, নলাকার, স্থিতিস্থাপক ও ফাঁপা। নালিকার ভিতরের ফাঁপা গহ্বরকে **লুমেন** (lumen) বলে। প্রত্যেক নালিকার প্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট **এপিথেলিয়াল কোষ**-এ গঠিত। কোষস্তরের বাইরের দিক একটি **ভিত্তি পর্দা** (basement membrane)-য় এবং ভিতরের দিক অসংখ্য **মাইক্রোভিলাই** (microvilli)-এ আবৃত। মাইক্রোভিলাই সম্মিলিতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) গঠন করে। নালিকাগুলো নিজে ততটা নড়নক্ষম নয় বরং হিমোসিলে হিমোলিম্ফের আন্দোলনে এগুলো রেচন সম্পন্ন করে।

কার্য পদ্ধতি / রেচন পদ্ধতি : প্রত্যেক ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ার অংশ নিঃসরণ বা ক্ষরণের জন্য এবং প্রান্তীয় অংশ শোষণের জন্য অভিযোজিত। এ নালিকার মুক্ত, বদ্ধ প্রান্ত হিমোলিম্ফে ভাসমান থেকে পানি, CO_2 এবং পটাসিয়াম ইউরেট আয়ন শোষণ করে। এগুলো নালিকার ভিতরে নির্দিষ্ট এনজাইমের প্রভাবে পটাসিয়াম বাইকার্বনেট, পানি ও ইউরিক এসিডে পরিণত হয়। নালিকার গোড়ার অংশ দিয়ে কিছু পানি ও বাইকার্বনেটসমূহ পুনঃশোষিত হয়ে হিমোলিম্ফে ফিরে আসে। রেচন বর্জ্যরূপে ইউরিক এসিড অবশিষ্ট পানির সাথে পৌষ্টিকনালির গহ্বরে প্রবেশ করে। মলাশয়ে অধিকাংশ পানি পুনঃশোষিত হয় এবং ইউরিক এসিড কঠিন মলের সাথে বর্জ্য পদার্থরূপে পায়ুপথে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

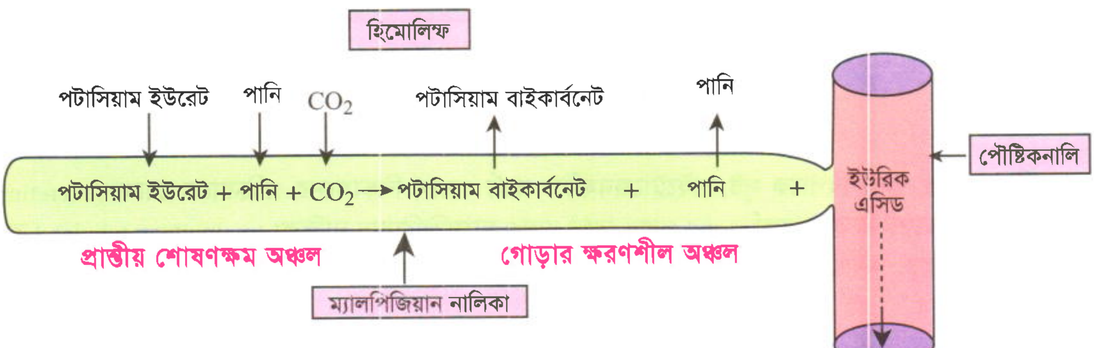

চিত্র ২.২.৩২ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার মাধ্যমে রেচন প্রক্রিয়া

অতিরিক্ত বা আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory Organ)

i. ইউরেট কোষ (Urate cell) : ঘাসফড়িং-এর দেহে অসংখ্য **ফ্যাট বডি** বা **চর্বিকোষ** থাকে। এগুলো প্রধানত শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিবর্তিতরূপে জমা রাখে। তাছাড়া এগুলো হিমোলিম্ফে বর্তমান কিছু ইউরিক এসিড ও ইউরেট কোষের মধ্যেই আজীবন জমা করে রাখে। ঘাসফড়িংয়ের দেহে অবস্থিত চর্বি সঞ্চয়কারী কোষই হচ্ছে ইউরেট কোষ।

ii. ইউরিকোজ গ্রন্থি (Uricose glands) : পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের মাশরুম গ্রন্থিতে **ইউরিকোজ গ্রন্থি** অবস্থান করায় হিমোসিল থেকে রেচন পদার্থ শোষণ করে ইউরিক এসিডরূপে জমা করে। সংগমের সময় এসব বর্জ্য শুক্রাণুর সাথে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

iii. নেফ্রোসাইট (Nephrocyte) : পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বদেশে অবস্থিত **নেফ্রোসাইট** রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

iv. কিউটিকল (Cuticle) : নিম্ফ দশায় হিমোসিলে ভাসমান অ্যামিবার মতো কিছু **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কোষ রক্ত থেকে রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে কিউটিকলের নিচে সঞ্চয় করে। খোলস মোচনের সময় পুরাতন কিউটিকলসহ সঞ্চিত রেচন দ্রব্য পরিত্যক্ত হয়।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান বডির মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	**ম্যালপিজিয়ান নালিকা**	**ম্যালপিজিয়ান বডি**
১. প্রকৃতি	ঘাসফড়িংসহ সকল পতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গ।	মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গের অংশ।
২. অবস্থান	প্রাণীর অন্ত্রের প্রাচীরে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	প্রাণীর বৃক্কের নেফ্রনে এককভাবে অবস্থান করে।
৩. সংখ্যা	অল্প, প্রতি ঘাসফড়িংয়ে প্রায় ১০০টি।	অসংখ্য, মানুষের দুই বৃক্কে প্রায় ২০ লক্ষ।
৪. গঠন	সূক্ষ্ম সুতার মতো, নলাকার; এপিথেলিয়াম আবরণ ও ভিত্তি পর্দা নিয়ে গঠিত।	গোল; কাপের মতো বোম্যানস ক্যাপস্যুল এবং কৈশিকজালিকার পিণ্ড গ্লোমেরুলাস নিয়ে গঠিত।
৫. সংযুক্তি	একপ্রান্ত হিমোসিলে মুক্ত থাকে, অন্যপ্রান্ত অন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে।	একপ্রান্ত নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার সাথে এবং অন্যপ্রান্ত রক্তনালিকার সাথে যুক্ত থাকে।
৬. কার্যপদ্ধতি	হিমোসিলে বিদ্যমান হিমোলিম্ফ থেকে রেচনবর্জ্য সংগ্রহ করে পৌষ্টিকনালিতে প্রেরণ করে।	রক্ত থেকে সূক্ষ্ম ছাঁকনের মাধ্যমে রেচনবর্জ্যসহ অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে নেফ্রন নালিকায় প্রেরণ করে।

ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ (Sensory Organs of Grasshopper)

যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে প্রাণিদেহে আগত বিশেষ উদ্দীপনা (স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, শব্দ, চাপ, তাপ ও আলোর তীব্রতা ইত্যাদি) গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে তাকে **সংবেদী অঙ্গ** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয়** বলে। ঘাসফড়িংয়ে নিচে বর্ণিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায় –

১. স্পর্শেন্দ্রিয় (Tactile organs) : ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত ছোট ছোট **রোম** ও **ব্রিসল** (bristle) স্পর্শেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। রোমগুলো শুঙ্গ, পাল্প, সারকি এবং পায়ের দূরবর্তী খণ্ডাংশে (distal segments) বিদ্যমান থাকে। এগুলো স্পর্শের মাধ্যমে অনুভূতি সংগ্রহ করে।

২. ঘ্রাণেন্দ্রিয় (Olfactory organs) : ঘাসফড়িং-এর মাথার সামনে দুটি **শুঙ্গ** বা **অ্যান্টেনা** (antenna) অবস্থিত। শুঙ্গদুটিতে বিদ্যমান **রোম** বস্তুর গন্ধ বা সৌরভ সংগ্রহকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। শুঙ্গ এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে খাদ্য নির্বাচন ও সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩. স্বাদেন্দ্রিয় (Gustatory organs) : ঘাসফড়িং খুব সহজেই খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে পারে। এদের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা বেশ প্রখর। স্বাদেন্দ্রিয় অঙ্গ প্রধানত মুখোপাঙ্গে থাকে। ম্যাক্সিলারি পাল্প ও ল্যাবিয়ামে অবস্থিত রোমের মাধ্যমে এরা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে।

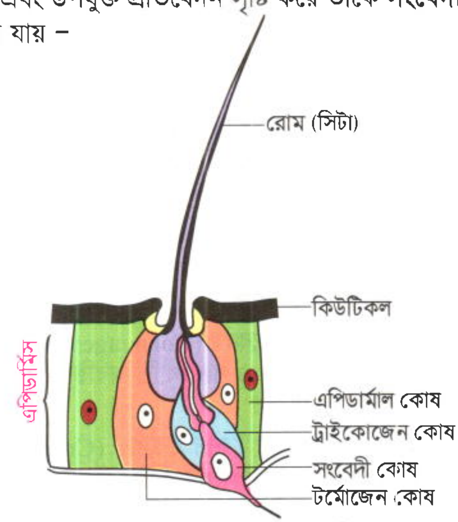

চিত্র ২.২.৩৩ : একটি সেনসিলা

৪. দর্শনেন্দ্রিয় (Visual organs) : ঘাসফড়িং-এ দর্শনাঙ্গ হিসেবে **ওসেলি** (ocelli) ও **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye) উভয়ই উপস্থিত থাকে। ওসেলির সাহায্যে ঘাসফড়িং আলোর তীব্রতার পরিবর্তন অনুধাবন করে। পুঞ্জাক্ষিতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

৫. শ্রবণেন্দ্রিয় (Auditory organs) : ঘাসফড়িং-এর ১ম উদরীয় খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে ডিম্বাকার **টিমপেনিক পর্দা** (tympanic membrane) রয়েছে যা শ্রবণের জন্য ব্যবহৃত **শ্রবণ থলি** বা **টিমপেনাম** (tympanum) কে ঢেকে রাখে। এছাড়া পায়ু সারকিতে অবস্থিত **রোম**ও শ্রবণ অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

৬. তাপেন্দ্রিয় (Thermal organs) : পায়ের প্রথম তিনটি টার্সাসের গোড়ায় বিদ্যমান **প্লান্টুলি প্যাড** এবং অ্যান্টেনার কিছু রোম ঘাসফড়িংয়ের তাপ সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

ঘাসফড়িংয়ের দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া উপরোক্ত সকল সংবেদী অঙ্গই ত্বকের এপিডার্মিসে অবস্থিত এবং এপিডার্মিসের কতকগুলো রূপান্তরিত কোষে গঠিত। কোষগুলোকে **সেনসিলি** (sensillae; একবচন- sensilla) বলে। প্রত্যেক

সেনসিলাতে একটি **সংবেদী কোষ** (sensory cell), একটি **ট্রাইকোজেন কোষ** (trichogen cell) এবং কয়েকটি **টর্মোজেন কোষ** (tormogen cell) থাকে। স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ সংবদী অঙ্গে সেনসিলা এককভাবে থাকে কিন্তু তাপ ও শব্দ সংবেদী অঙ্গে সেনসিলি গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) — গঠন ও দর্শন কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে **পুঞ্জাক্ষি** বলে। প্রত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার (প্রজাতিভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) ষড়ভূজাকার **ওমাটিডিয়া** (ommatidia) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি

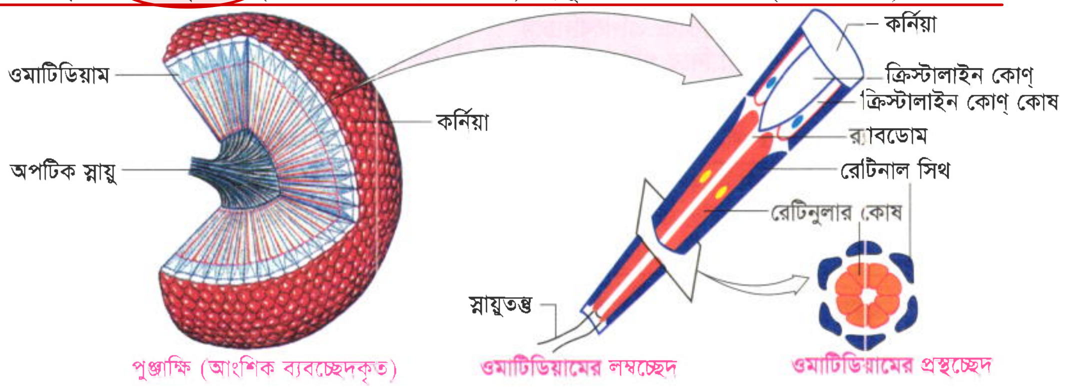

চিত্র ২.২.৩৪ : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (বায়ে) এবং একটি ওমাটিডিয়াম (ডানে)

ওমাটিডিয়াম (একবচনে) একেকটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে। সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত থাকে। পুঞ্জাক্ষিতে অবস্থিত প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের। নিচে একটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলো।

১. **কর্নিয়া (Cornea) :** এটি ওমাটিডিয়ামের বাইরের দিকের বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উত্তল ও ছয়কোণা **কিউটিকল** আবরণী। এটি লেন্সের মতো কাজ করে।

২. **কর্নিয়াজেন কোষ (Corneagen cell) :** এগুলো কর্নিয়ার নিচে একজোড়া চাপা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোষ। এসবের ক্ষরণ থেকে **কর্নিয়া** সৃষ্টি হয়।

৩. **ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ (Crystalline cone cell):** এগুলো কর্নিয়াজেন কোষের নিচে ক্রিস্টালাইন কোণকে ঘিরে অবস্থিত দীর্ঘ ৪টি কোষ। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে **ক্রিস্টালাইন কোণ** গঠিত হয়।

৪. **ক্রিস্টালাইন কোণ (Crystalline cone) :** এটি কোণ কোষে পরিবেষ্টিত এবং এগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি স্বচ্ছ, মোচাকৃতি অঙ্গ। কোণ কোষ থেকে নিঃসৃত পদার্থে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়। এটি প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

৫. **আইরিশ রঞ্জক আবরণ (Iris pigment sheath) :** এগুলো দীর্ঘ রঙিন (কালো কণিকা বহনকারী) কোষ যা কোণ কোষগুলোকে ঘিরে রাখে। তীব্র আলোতে এ আবরণ প্রসারিত হয়ে কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, আবার মৃদু আলোকে সংকুচিত হয়ে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

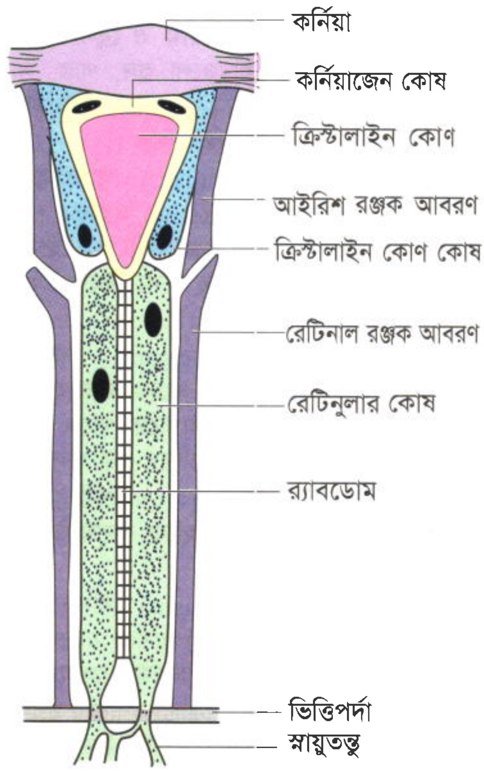

চিত্র ২.২.৩৫ : একটি ওমাটিডিয়াম (লম্বচ্ছেদ)

৬. রেটিনুলার কোষ (Retinular cell) : কোণ কোষগুলোর নিচে বৃত্তাকারে সজ্জিত ৭/৮টি লম্বা কোষকে **রেটিনুলার কোষ** বলে। এগুলোর নিউক্লিয়াস কোণ কোষ সংলগ্ন প্রান্তে অবস্থিত। এসব কোষ একদিকে কোণ কোষের সাথে অন্যদিকে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে **র‍্যাবডোম** গঠিত হয়, এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭. র‍্যাবডোম (Rhabdome) : ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত এ অংশটি অনুপ্রস্থভাবে রেখান্বিত। একে ঘিরে অবস্থিত রেটিনুলার কোষগুলোর ক্ষরণ থেকেই র‍্যাবডোম গঠিত ও পুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে আলো গৃহীত হয়। এখানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। [MAT- 2014-15]

৮. রেটিনাল রঞ্জক আবরণ (Retinal pigment sheath) : এটি রেটিনুলার কোষকে ঘিরে রঞ্জকময় কোষে গঠিত কালো পর্দার একটি আবরণ। এটি প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এ পর্দার রঞ্জক পদার্থ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে।

৯. ভিত্তিপর্দা (Basal membrane) : ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে তার নাম **ভিত্তিপর্দা**। এটি ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে।

১০. স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre) : প্রতিটি রেটিনুলার কোষ থেকে **স্নায়ুতন্তু** বেরিয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয়। এসব তন্তু ওমাটিডিয়ার মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

পুঞ্জাক্ষি (জটিল চোখ) এবং সরলাক্ষি (সরল চোখ)-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুঞ্জাক্ষি	সরলাক্ষি
১. অবস্থান	আর্থ্রোপোড প্রাণিদের মাথার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে।	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে মাথার সম্মুখ ভাগে ও মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মাথার দুপাশে, কোটরের ভিতরে।
২. গঠন	গোল বা বৃক্কাকার, অসংখ্য ওমাটিডিয়া একক নিয়ে গঠিত।	প্রায় গোল, সরলাক্ষি নিজেই একটি একক।
৩. এককের উপাদান	কর্নিয়া, কর্নিয়াজেন কোষ, কোণ কোষ, ক্রিস্টালাইন কোণ, আইরিশ আবরণী, রেটিনাল আবরণী, র‍্যাবডোম ইত্যাদি।	কর্নিয়া, আইরিশ, লেন্স, রেটিনা, কোরয়েড, স্ক্লেরা, পেশি, প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি।
৪. আইরিশ আবরণী	অসংখ্য ও লম্বা।	একটি এবং গোল।
৫. স্ক্লেরা ও কোরয়েড	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৬. প্রতিবিম্ব	মৃদু আলো ও উজ্জ্বল আলোতে ভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	সবক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

দর্শন কৌশল (Mechanism of Vision)

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে প্রাণী বস্তুকে অবলোকন করে। ঘাসফড়িং **দিবাচর শস্যভোজী** প্রাণী। দিনের **উজ্জ্বল** (তীব্র) আলো ও দিনের শেষে **স্তিমিত** (মৃদু) আলো– দুসময়েই এদের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। এজন্য দুটো ভিন্ন দর্শন কৌশল রয়েছে। এরা মানুষের চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনো চলমান বস্তু দেখতে পারে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে দেখতে পায়না। প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খণ্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিম্বের সংবেদন **অপটিক স্নায়ু** (optic nerve)-র মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। **আলোর তীব্রতা অনুসারে পুঞ্জাক্ষিতে দুধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, যথা– মোজাইক প্রতিবিম্ব এবং সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব।**

১. তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition Image)

দিনে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে **মোজাইক প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয় এবং এতে প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিনাল রঞ্জক আবরণী অভিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণ আবৃত করে রাখে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল লম্বভাবে পতিত

আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টাইলাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া ভেদ করলেও আইরিশ ও রেটিনাল অভিন্ন আবরণীতে শোষিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত প্রতিবিম্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিম্বটি গঠিত হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্ব **মোজাইক প্রতিবিম্ব** এবং একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

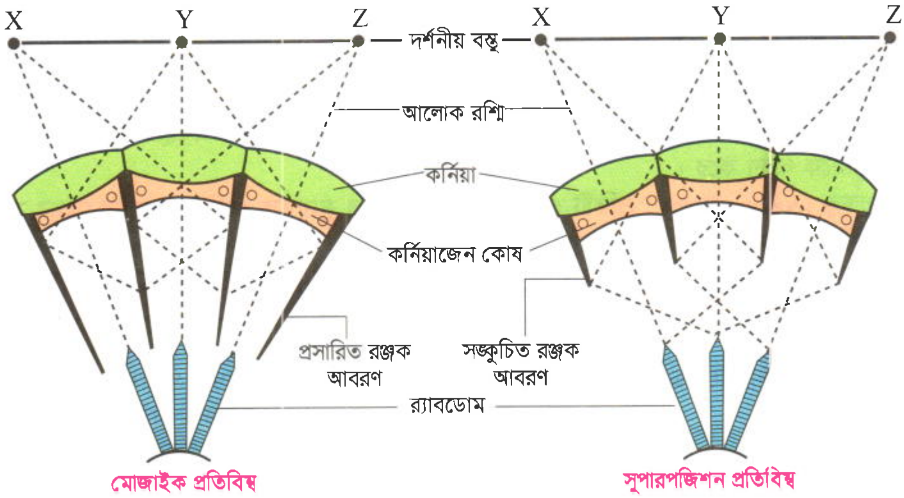

চিত্র ২.২.৩৬ : ঘাস ফড়িংয়ের দর্শন কৌশল

২. মৃদু বা স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition Image)

সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয়। অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণী কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিনাল রঞ্জক আবরণী ভিত্তি পর্দার দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিডিয়াম অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোণ ও র‍্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু থেকে সরাসরি আসা আলোকরশ্মি সোজাসুজি কর্নিয়া, ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে পৌঁছায়। আবার দর্শন বস্তু থেকে তির্যকভাবে আসা আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক আবরণীদুটির বাধা না থাকায় আলোকরশ্মির এধরনের চলাচল সম্ভব হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি এভাবে একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অস্পষ্ট ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলে।

মোজাইক প্রতিবিম্ব ও সুপারপজিসন প্রতিবিম্বের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	মোজাইক প্রতিবিম্ব	সুপারপজিসন প্রতিবিম্ব
১. আলোর অবস্থা	তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	মৃদু বা স্তিমিত আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
২. রঞ্জক আবরণী	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী প্রসারিত হয়।	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী সংকুচিত হয়।
৩. আলোকরশ্মি	কেবল উলম্ব আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	তির্যক ও উলম্ব উভয় আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৪. প্রতিবিম্বের ধরণ	বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর (Process of Reproduction and Metamorphosis)

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System)

ঘাসফড়িং **একলিঙ্গ প্রাণী** (dioecious animal), কেননা পুং ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে সৃষ্টি হয়। এদের **যৌন দ্বিরূপতা** (sexual dimorphison) সুস্পষ্ট। একটি পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং বাইরে থেকে দেখে খুব সহজে চেনা যায়। স্ত্রী ফড়িং-এর উদরের **ওভিপজিটর** (ovipositor) দেখে পুরুষ সদস্য থেকে আলাদা করা হয়। ঘাসফড়িং-এর প্রজননতন্ত্র হিমোসিলের পেরিভিসেরাল সাইনাসে অবস্থান করে। নিচে পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সম্বন্ধে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হলো।

পুংজননতন্ত্র (Male Reproductive Organ)

ঘাসফড়িং-এর পুংজননতন্ত্র **শুক্রাশয়, শুক্রনালি, ক্ষেপননালি, সহায়ক গ্রন্থি** ও **শুক্রথলি** নিয়ে গঠিত। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. শুক্রাশয় (Testes) : পুংজননতন্ত্রের মুখ্য সংগঠক একজোড়া **শুক্রাশয়**। শুক্রাশয়দুটি ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দেহ খন্ডকের উদর গহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দিয়ে যুক্ত থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় অনেকগুলো ক্ষুদ্রাকায় স্বচ্ছ **ফলিকল** (follicle) গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। ফলিকলগুলোর মধ্যে **শুক্রাণু** (sperm) উৎপন্ন হয়।

২. শুক্রনালি (Vas Deferens) : প্রতিটি শুক্রাশয়ের অঙ্কীয়দেশ থেকে একটি লম্বা ও প্যাঁচানো **শুক্রনালি** যুক্ত থাকে।

৩. ক্ষেপননালি (Ejaculatory Duct) : নবম উদর খন্ডকে দুপাশের দুটি শুক্রনালি মিলিত হয়ে একটি সাধারণ সঙ্কোচনশীল **ক্ষেপননালি** গঠন করে। এটি পুংসঙ্গম অঙ্গ বা **শিশ্ন** (penis)-এর মাধ্যমে দেহের বাইরে মুক্ত হয়।

৪. সহায়ক গ্রন্থি (Accessory Gland) : লম্বা নালিগুচ্ছ সমন্বিত একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** ক্ষেপননালিতে উন্মুক্ত হয়। এসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তরলে শুক্রাণু নিমজ্জিত থাকে ও পুষ্টি গ্রহণ করে।

৫. শুক্রথলি (Seminal Vesicle) : সহায়ক গ্রন্থির সাথে একটি লম্বা, প্যাঁচানো নালিকা বা **শুক্রথলি** যুক্ত থাকে। এটি ক্ষেপননালিতে উন্মুক্ত হয়। এতে শুক্রাণু সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনের সময় ক্ষেপননালিতে প্রবেশ করে।

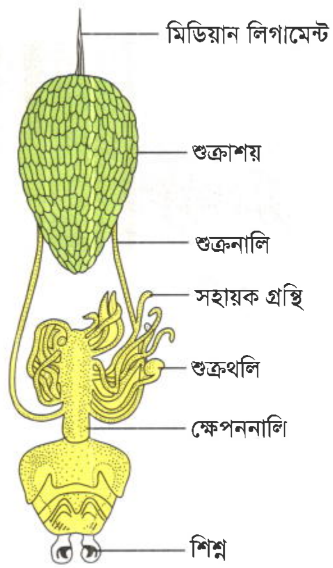

চিত্র ২.২.৩৭ : পুংজননতন্ত্র

স্ত্রীজননতন্ত্র (Female Reproductive Organ)

ঘাসফড়িং-এর স্ত্রীজননতন্ত্র **ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনি, শুক্রধানি** এবং **সহায়ক গ্রন্থি** নিয়ে গঠিত। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. ডিম্বাশয় (Ovary) : একজোড়া **ডিম্বাশয়** স্ত্রীজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ। ডিম্বাশয়দুটি অন্ত্রের উপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** দিয়ে পৃষ্ঠপ্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নলাকার ৬-৮টি **অণুডিম্বাশয়** বা **ওভারিওল** (ovarioles) নিয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়ে **ডিম্বাণু** (egg) উৎপন্ন হয়ে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

২. ডিম্বনালি (Oviduct) : প্রত্যেক ডিম্বাশয়ের অণুডিম্বাশয়গুলো গোড়ার অংশ দিয়ে একত্রে মিলিত হয়ে একটি **ডিম্বনালি** গঠন করে।

৩. যোনি (Vagina) : দুপাশের দুটি ডিম্বনালি ৭ম উদরীয় খণ্ডকে মিলিত হয়ে একটি পেশিবহুল **যোনি** গঠন করে যা **ওভিপজিটরের** দুটি অংশের মাঝে অবস্থান করে। এটি ওভিপজিটর হয়ে স্ত্রী জননরন্ধ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র ২.২.৩৮ : স্ত্রীজননতন্ত্র

৪. **শুক্রধানি বা স্পার্মাথেকা (Spermatheca) :** যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুণ্ডলীকৃত **স্পার্মাথেকা নালি** যুক্ত থাকে। এ কুন্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে একটি থলির মতো **শুক্রধানি** বা **স্পার্মাথেকা** থাকে। এতে সঙ্গমকালে পুরুষ ঘাসফড়িং থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণু সাময়িক জমা থাকে।

৫. **সহায়ক গ্রন্থি (Accessory Gland) :** প্রত্যেক ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একটি **সহায়ক গ্রন্থি** বা **কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি** (collaterial gland) রয়েছে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে এসে সংযুক্ত হয়। এ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রস (সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ) ডিম পাড়ার পর এগুলো থোকাবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

প্রজনন প্রক্রিয়া (Process of Reproduction)

ঘাসফড়িংয়ে **যৌন** (sexual) প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটে। এর প্রজনন প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

চিত্র ২.২.৩৯ : যৌনমিলন

১. **যৌনমিলন (Copulation) :** গ্রীষ্মের শেষদিকে ঘাসফড়িং-এর যৌনমিলন ঘটে। এ সময় পুরুষফড়িং স্ত্রীফড়িং-এর পিঠে উঠে আটকে থাকে এবং এ অবস্থায় শিশ্নপথে স্ত্রীফড়িং-এর যোনিতে সেমিনাল ফ্লুইড ত্যাগ করে। সেমিনাল ফ্লুইডে শুক্রাণু থাকে। ডিম না পাড়া পর্যন্ত শুক্রাণুগুলো স্পার্মাথিকায় জমা থাকে। ডিম পাড়ার আগে কয়েকবার মিলন হতে পারে।

২. **নিষেক (Fertilization) :** যৌন মিলনের এক পর্যায়ে পুরুষ-প্রাণিদেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের পরস্পর একীভবনে **নিষেক** সম্পন্ন হয়। ঘাসফড়িং-এর নিষেক অন্তঃস্থ (internal)। ৩–৫ মি.মি. লম্বা ডিম্বাণুটি **কুসুম** (yolk) সমৃদ্ধ এবং ডিম্বনালি দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নরম **ভাইটেলাইন ঝিল্লি** (vitelline membrane) ও শক্ত-নমনীয় বহিঃস্থ **কোরিওন** (chorion)-এ আবৃত হয়। স্পার্মাথেকা রন্ধ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিম নিষিক্ত হয়। কোরিওনের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। এ ছিদ্রটিকে **মাইক্রোপাইল** (micropyle) বলে।

৩. **ডিমপাড়া বা ওভিপজিসন (Oviposition) :** মিলনের পর থেকে কিছুদিন পর পর স্ত্রী ঘাসফড়িং লম্বা, বাদামি রংয়ের ডিম পাড়তে শুরু করে। শরৎকাল পর্যন্ত ডিমপাড়া অব্যাহত থাকে। স্ত্রী ফড়িং ওভিপজিটরের সাহায্যে ১০ সে.মি. গভীর একটি গর্ত করে এর ভিতরে গুচ্ছাকারে ২০টি ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকে। একটি স্ত্রী-ফড়িং এভাবে ১০টি গুচ্ছে মোট ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ঘাসফড়িংই মারা যায়।

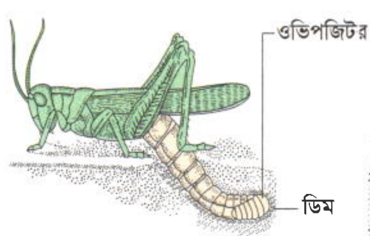

চিত্র ২.২.৪০ : ঘাসফড়িং ডিম পাড়ছে

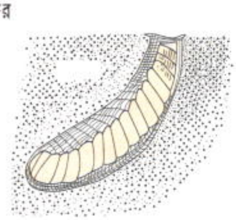

চিত্র ২.২.৪১ : গর্তের ভিতর ডিমের গুচ্ছ

৪. **পরিস্ফুটন (Development) :** ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু **সেন্ট্রোলেসিথাল** (centrolecithal) ধরনের অর্থাৎ এর কুসুম কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পরিস্ফুটন অব্যাহত থাকে। শীতকালে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ সময়কালটি **ডায়াপজ** (diapause) নামে পরিচিত। তখন শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থার (প্রচন্ড শীত ও খাদ্যাভাব) মুখোমুখি যেন শিশু ফড়িংকে পড়তে না হয় সে কারণে ডায়াপজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বসন্তের আগমনে উষ্ণ পরিবেশ ফিরে এলে আবার বৃদ্ধি শুরু হয় এবং অতি ক্ষুদ্রাকায় শিশু ঘাসফড়িং-এর জন্ম হয়।

রূপান্তর (Metamorphosis)

পতঙ্গের ভ্রূণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে। রূপান্তর প্রধানত দুধরনের– **১. অসম্পূর্ণ** ও **২. সম্পূর্ণ রূপান্তর।**

১. অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis) : যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ (শিশু) দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে **অসম্পূর্ণ রূপান্তর** বলে। প্রত্যেক নিম্ফ দশা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রতিরূপের মতো, কিন্তু এগুলো ডানা ও জননাঙ্গবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্ণপার্থক্য প্রদর্শন করে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। উদাহরণ– ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর।

২. সম্পূর্ণ রূপান্তর (Complete metamorphosis) : যে রূপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের রূপান্তরকে **সম্পূর্ণ রূপান্তর** বলে। উদাহরণ– মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর। এ ক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছে: ডিম → লার্ভা → পিউপা → ইমাগো (পূর্ণাঙ্গ)। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **লার্ভা** (larva) বলে।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর **অসম্পূর্ণ** বা **হেমিমেটাবোলাস** (hemimetabolous) ধরনের, কারণ এদের অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্ফ দশা পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-য়ে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িংয়ের জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ রয়েছে: ডিম → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী।

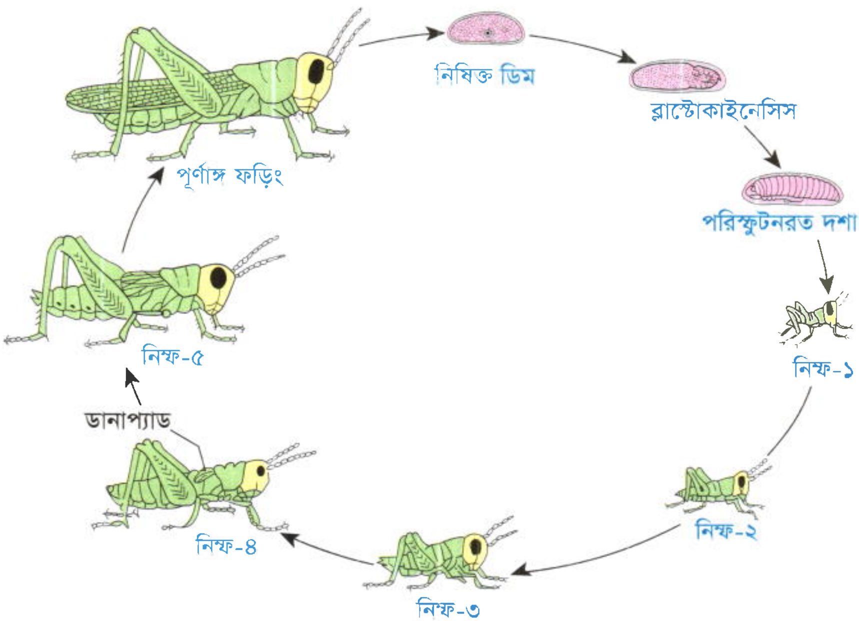

চিত্র ২.২.৪২ : ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্র

ডিম ফুটে যে তরুণ ঘাসফড়িং বেরিয়ে আসে তাকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। বহির্গঠনের দিক থেকে নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং দেখতে প্রায় এক রকম, অন্ততঃ মুখোপাঙ্গ, সরলাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনি, পায়ু প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, নিম্ফের জীবনধারণ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য ও বসতিও এক রকম। নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ পার্থক্য হচ্ছে নিম্ফে ডানা ও জননাঙ্গ থাকে না, তা ছাড়া দেহের আকার-আকৃতি ছোট থাকে। পূর্ণাঙ্গ হলে ডানা ও জননাঙ্গের পরিস্ফুটন ঘটে, দেহের আকারও বড় হয়।

সদ্য পরিস্ফুটিত নিম্ফের কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল থাকে স্বচ্ছ, ক্রমশ গাঢ় হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এ নিম্ফ একটু বড় হলে বহিঃকঙ্কাল আঁটসাট হয়ে দেহবৃদ্ধি রহিত করে দেয়। তখন দেহবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে পুরনো বহিঃকঙ্কাল মোচন বা **মোল্টিং** (molting) প্রক্রিয়ায় ত্যাগ করে ২য় ধাপের নিম্ফে পরিণত হয়। পরে আরও ৩ বার খোলস মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের নিম্ফে ক্ষুদ্রাকায় **ডানা প্যাড** (wing pad) থেকে ডানা সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। প্রতিবার খোলস মোচনের পর নিম্ফ দেখতে ছোট আকৃতির পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মতো দেখায়। তা ছাড়া, এদের পরিস্ফুটনে কোনো বিশ্রাম দশাও নেই। পঞ্চম বার খোলস মোচনের মাধ্যমে নিম্ফ পরিণত ঘাসফড়িং হয়ে উঠে। দুটি মোচনের মধ্যবর্তী দশাকে **ইনস্টার** (instar) বলে। ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর সম্পন্ন হতে প্রায় দুমাস সময় লাগে।

পতঙ্গের লার্ভা ও নিম্ফ এর মধ্যে পার্থক্য

লার্ভা	নিম্ফ
১. দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়।	১. দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো।
২. রূপান্তরের সময় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।	২. রূপান্তরের সময় বৈশিষ্ট্যের সীমিত পরিবর্তন ঘটে।
৩. রূপান্তরিত হয়ে পিউপায় পরিণত হয়।	৩. রূপান্তরিত হয়ে ইমাগোতে পরিণত হয়।
৪. মৌমাছি, মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গে দেখা যায়।	৪. আরশোলা, ঘাসফড়িং বা ঝিঁঝিঁ পোকা, উইপোকা ইত্যাদি পতঙ্গে দেখা যায়।

রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িং-এর দেহে ৪ ধরনের **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (endocrine glands) পাওয়া যায়– **ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি, করপোরা অ্যালাটা** এবং **করপোরা কার্ডিয়াকা**। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ঘাসফড়িং–এর রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ (Intercerebral gland cells) : মস্তিষ্কে অবস্থানকারী এ গ্রন্থি কোষগুলো **প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন** বা **মস্তিষ্ক হরমোন** (Prothoracicotropic hormone or Brain hormone) ক্ষরণ করে যা প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

২. প্রোথোরাসিক গ্রন্থি (Prothoracic gland) : অগ্রবক্ষে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **একডাইসন হরমোন** (ecdysone hormone) ক্ষরণ করে যা নিম্ফ দশায় খোলস মোচন বা **মোল্টিং** (ecdysis or moulting) নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দেহে টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

৩. করপোরা অ্যালাটা (Corpora allata) : নিম্ফ দশায় এ গ্রন্থি থেকে **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile hormone -neotinin) ক্ষরিত হয় যা নিম্ফদশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হরমোনের প্রভাবেই ঘাসফড়িং- এর নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ঘাসফড়িং-এর করপোরা অ্যালাটা থেকে **গোনাডোট্রপিক হরমোন** (Gonadotropic hormone) নিঃসৃত হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের জনন অঙ্গের পরিণতি ঘটায়।

৪. করপোরা কার্ডিয়াকা (Corpora cardiaca) : মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালির দুপাশে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **গ্রোথ হরমোন** (growth hormone) নিঃসরণ করে। এ হরমোন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং- এর মধ্যে পার্থক্য		
তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	নিম্ফ (Nymph)	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং (Adult Grasshopper)
১. অবস্থা	১. ঘাসফড়িং-এর স্বাধীনজীবী অপরিণত অবস্থার নাম **নিম্ফ** ।	১. ঘসিফড়িং-এর স্বাধীনজীবী পরিণত অবস্থার নাম **ইমাগো** বা পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং ।
২. আবির্ভাব	২. পরিণত ঘাসফড়িং যৌন প্রজননের মাধ্যমে নিম্ফের জন্ম দেয় ।	২. নিম্ফ আংশিক রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ পরিণত হয় ।
৩. আকার	৩. আকারে বেশ ছোট ।	৩. আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ।
৪. বর্ণ	৪. ফ্যাকাশে ।	৪. সবুজাভ ।
৫. ডানা	৫. অনুপস্থিত, তবে অতি ক্ষুদ্র ডানা প্যাড থাকে ।	৫. দুজোড়া ডানা উপস্থিত ।
৬. প্রজননতন্ত্র	৬. অসম্পূর্ণ ও অবিকশিত ।	৬. সম্পূর্ণ ও বিকশিত ।
৭. মোল্টিং	৭. বহুবার খোলস মোচন বা **মোল্টিং** ঘটে ।	৭. মোল্টিং ঘটে না ।

ঘাসফড়িং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Grasshopper)

১. শস্যের ক্ষতিকর পোকা হিসেবে (As Crop Pests) : ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ উভয়েই বিভিন্ন ধরনের শস্য খেয়ে প্রভূত ক্ষতি করে । পঙ্গপাল এক জায়গা বা এক শস্যক্ষেত থেকে নতুন শস্যক্ষেতে এবং বাগানের সবজি ক্ষেতে গমন করে । গমনে একক বা দলবদ্ধভাবে অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে । **মাইগ্রেটরি পঙ্গপাল** (*Locusta migratoria*) সুদূর অতীতকাল থেকেই এ ধরনের ক্ষতিকর পতঙ্গ হিসেবে পরিচিত । বাসস্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলে এগুলো লতা, গাছের ডাল, কাঠ এমনকি এদের ভিতরকার দুর্বল সদস্যকে পর্যন্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে । কোনো কোনো সময় ফড়িং-এর আক্রমণে শস্যের এত বেশি ক্ষতি হয় যে, তা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব হয় না ।

২. খাদ্য হিসেবে (As Food) : পরিবেশের খাদ্যতন্ত্র বা খাদ্যশৃঙ্খলে (food chain) অনেক উপকারী শিকারী প্রাণীর (predatory animals) প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং-এর বিশেষ স্থান আছে । অনেক শিকারী পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, সরিসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয় । মৃত বা জীবিত অবস্থায় মাছের টোপ (fish-bait) হিসেবেও ঘাসফড়িং-এর ব্যবহার রয়েছে ।

পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । **গ্রিক পঙ্গপাল** (Greek Ground Locust) গুড়া করে অনেকে ময়দা বানিয়ে খায় । মেক্সিকো, জাপান এবং ফিলিপাইনে প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয় । আমেরিকা, ভারত ও অন্যান্য দেশের আদিবাসীরা সচরাচর সকল সময়েই খাবার হিসেবে এটি খেয়ে থাকে ।

৩. পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে : গাছের পচন ও সেই মাটিকে উর্বর করে পুনর্জন্ম ঘটিয়ে, আগাছা খেয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্টি রক্ষায়, মলত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পর নিজেকে বিলীন করে দিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়াতে ঘাসফড়িং অবদান রাখে ।

৪. মাধ্যমিক পোষক হিসেবে (As Intermediate Host) : কিছু চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমি ঘাসফড়িংকে আক্রমণ করে এদের দেহে জীবনচক্রের একটি পর্যায় অতিক্রম করে । পোকাগুলো কৃমির **মাধ্যমিক পোষক** হিসেবে কাজ করে । যদি কোনো পাখি বা সরিসৃপ কখনও খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং খায় তখন এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে । এভাবে মেরুদণ্ডী পোষক আক্রান্ত হয় ।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. ঘাসফড়িং-এর কিছু প্রজাতি দলবদ্ধ বাস করে, পরিযায়ী স্বভাবের এবং যারা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে তাদেরকে পঙ্গপাল বা লোকাস্ট বলে।

২. ঘাসফড়িং-এর দেহ কাইটিন নির্মিত কিউটিকল দিয়ে আবৃত। কিউটিকল বহিঃকঙ্কালের কাজ করে।

৩. ঘাসফড়িং-এর প্রত্যেক দেহখণ্ডকের কিউটিকল পাতের মতো। এদের স্ক্লেরাইট বলে।

৪. স্ক্লেরাইটের পৃষ্ঠীয় অংশকে টারগাম, অঙ্কীয় অংশকে স্টার্নাম ও পার্শ্বীয় অংশকে প্লিউরন বলে।

৫. স্ক্লেরাইটগুলোর সংযোগস্থল সূচার নামে পাতলা নরম ঝিল্লিতে আবৃত। সূচারের উপস্থিতির কারণে দেহখণ্ডক ও উপাঙ্গগুলো সহজেই নড়াচড়া করতে পারে।

৬. ঘাসফড়িং-এর মস্তক ৬টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। মস্তকের পৃষ্ঠদেশে ত্রিকোণাকার অঞ্চলটিকে ভার্টেক্স বলে।

৭. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ চর্বন উপযোগী। একটি ল্যাব্রাম, একজোড়া ম্যান্ডিবল, একজোড়া ম্যাক্সিলা, একটি ল্যাবিয়াম ও একটি হাইপোফ্যারিংক্স নিয়ে মুখোপাঙ্গ গঠিত।

৮. ঘাসফড়িং-এর মস্তক দেহের সম্মুখ প্রান্তে নিচের দিকে নির্দেশিত অবস্থায় থাকে। পতঙ্গের এ ধরনের মস্তককে হাইপোগন্যাথাস বলে।

৯. ঘাসফড়িং-এর দেহে তিনজোড়া পদ থাকে। প্রত্যেক পদ কক্সা, ট্রোক্যান্টার, ফিমার, টিবিয়া ও টার্সাস নিয়ে গঠিত।

১০. টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে টার্সোমিয়ার বলে। প্রথম টার্সোমিয়ারের প্রান্তে দুটি বাঁকানো নখর থাকে। নখরদুটির মাঝে পালভিনাস নামক একটি আসঞ্জন প্যাড থাকে।

১১. ঘাসফড়িং-এর দুজোড়া ডানা থাকে। সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পিছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। পিছনের ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো, স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে।

১২. ঘাসফড়িং-এর অন্ননালির পিছনে উদরের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত স্ফীত থলির মতো অংশটি ক্রপ। এর প্রাচীর পাতলা, তবে পেশিবহুল। খাদ্য জমা রাখা ও আংশিক পরিপাক করা এর কাজ।

১৪. ঘসিফড়িং-এর ক্রপের পরবর্তী কোণাকৃতির শক্ত ও পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি গিজার্ড। এর অন্তঃপ্রাচীর কাইটিনময় ৬টি দাঁতযুক্ত। দাঁতের পিছনে রোমযুক্ত প্যাড বা ব্রিসল এবং প্রসারিত কপাটিকা থাকে। খাদ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করা এর প্রধান কাজ। ব্রিসল ছাঁকনির কাজ করে।

১৫. ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালির গিজার্ড ও মেসেন্টেরনের সংযোগস্থলে অবস্থিত ৬ জোড়া বদ্ধ, সরু, লম্বা, পাচক রস ক্ষরণকারী আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধনকে হেপাটিক সিকা বলে।

১৬. ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও মুক্ত ধরনের অর্থাৎ রক্ত নির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে প্রবাহিত না হয়ে পেরিভিসেরাল গহ্বর বা হিমোসিলের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন টিস্যুকোষে প্রবাহিত হয়।

১৭. ঘাসফড়িং-এর রক্ত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরে লসিকার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে এর রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে। হিমোলিম্ফে শ্বসন রঞ্জক থাকে না বলে শ্বসনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনা। দ্রবীভূত খাদ্য সংগ্রহ, পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করা হিমোলিম্ফের কাজ।

১৮. ঘাসফড়িংসহ সকল সন্ধিপদী প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে না, এটি রক্তে পূর্ণ এবং সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের রক্তপূর্ণ অপ্রকৃত দেহগহ্বরকে হিমোসিল বলে।

১৯. ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুদৈর্ঘ্য পর্দা বা ডায়াফ্রাম দিয়ে যে তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে তাদের সাইনাস বলে। যেমন– পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস, পেরিভিসেরাল সাইনাস ও পেরিনিউরাল সাইনাস।

২০. ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্র ৭টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দুপাশে একটি করে ছিদ্র থাকে। ছিদ্র দুটিকে অস্টিয়া বলে।

২১. ঘাসফড়িং শ্বাসকার্য সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও এর শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে

তাকে ট্রাকিয়াল তন্ত্র বলে।

২২. ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট ১০ জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে। এদের মধ্যে ২ জোড়া বক্ষে ও ৮ জোড়া প্রথম ৮টি উদরীয় খণ্ডকে অবস্থান করে। এ শ্বাসরন্ধ্রগুলোকে স্পাইরাকল বলে।

২৩. ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরীণ গাত্র কাইটিন নির্মিত সর্পিলাকার চক্র দ্বারা সুরক্ষিত। এদেরকে টিনিডিয়া বলে।

২৪. ঘসিফড়িং-এর ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড় এবং পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট যে থলির মতো অংশ গঠন করে তাকে বায়ুথলি বলে। বায়ুথলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

২৫. ম্যালপিজিয়ান নালিকা ঘাসফড়িংয়ের প্রধান রেচন অঙ্গ। মধ্য ও পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে ম্যালপিজিয়ান নালিকা অবস্থান করে। এরা পীতবর্ণের সূক্ষ্ম সুতার মতো। নালিকাগুলোর মুক্ত প্রান্ত বন্ধ, অপর প্রান্ত পৌষ্টিকনালির গহ্বরে উন্মুক্ত। এটি ছাড়াও ফ্যাট বডি রেচনে অংশগ্রহণ করে এবং খোলক মোচনের সময় কিছু রেচন পদার্থ পরিত্যক্ত হয়।

২৬. ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষি বলে। প্রত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার ষড়ভূজাকার ওমাটিডিয়া নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ওমাটিডিয়াম (একবচনে) এককেটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে।

২৭. দিনের বেলায় উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে মোজাইক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় এবং এতে প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

২৮. সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোয় ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এতে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি এভাবে একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ে।

২৯. ঘাসফড়িং একলিঙ্গ প্রাণী। এদের যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায় অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী শনাক্ত করা যায়। উদরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ওভিপজিটর (ডিম পাড়ার অঙ্গ) দেখে স্ত্রী ঘাসফড়িং শনাক্ত করা যায়।

৩০. আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত বেশ কিছু প্রাণী বিশেষত পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণীরা (যেমন–ঘাসফড়িং) দৈহিক বৃদ্ধির জন্য যে প্রক্রিয়ায় বারবার বহিঃকঙ্কাল বা খোলস বদলায়, সে প্রক্রিয়াকে একডাইসিস বা মোল্টিং বলে। প্রোথোরাসিক গ্রন্থি নিঃসৃত একডাইসন বা মোচন হরমোনের প্রভাবে ঘাসফড়িং-এ একডাইসিস বা মোল্টিং সংঘটিত হয়। পরপর দুটি মোল্টিংয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইনস্টার বলে।

৩১. ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গে ডিম ফুটে যে শিশু দশা বের হয়ে আসে তাকে নিম্ফ বলে। নিম্ফের গঠন, খাদ্যরুচি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকারে ছোট, মস্তক তুলনামূলকভাবে বড়, অ্যান্টিনা খাটো, জননঅঙ্গ অসম্পূর্ণ ও এদের ডানা থাকে না।

৩২. যখন কোনো জীবের ভ্রূণ দশা হতে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্তি কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনীয় ধাপের মাধ্যমে ঘটে, তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে। রূপান্তর প্রধানত দুধরনের, যথা-অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ রূপান্তর।

৩৩. যে রূপান্তরের কোনো প্রাণীর শিশু অবস্থা উল্লেখ্যযোগ্য কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এক্ষেত্রে শিশু অবস্থার নাম নিম্ফ এবং এর সাথে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর যথেষ্ট আঙ্গিক মিল থাকে। ঘাসফড়িং, আরশোলা প্রভৃতি পতঙ্গে এ ধরনের রূপান্তর দেখা যায়।

৩৪. যে রূপান্তরে কোনো প্রাণীর শিশু অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এক্ষেত্রে শিশু অবস্থার নাম লার্ভা, এর সাথে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না। মশা, মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গে এ ধরনের রূপান্তর দেখা যায়।

৩৫. ডায়াপোজ হলো ঘাসফড়িং-এর বিশেষ এক ধরনের অভিযোজন, যার ফলে এদের নিম্ফ বা শিশুগুলো প্রতিকূল পরিবেশের প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাবের হাত থেকে রক্ষা পায়। ঘাসফড়িং-এর ডিম প্রতিকূল আবহাওয়ার (শীতকালে) কারণে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ অবস্থাকে ডায়াপোজ বলে। এরা সম্পূর্ণ শীতকাল ডায়াপোজ অবস্থায় অতিক্রম করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হেপাটিক সিকাতে কত জোড়া লম্বা, স্বচ্ছ নালিকা থাকে ?
(ক) ৪ জোড়া (খ) ৬ জোড়া
(গ) ৩ জোড়া (ঘ) ৫ জোড়া

২. অ্যালারি পেশির বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
(ক) হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বীয় অঙ্কীয়দেশ থেকে মুক্ত থাকে
(খ) ত্রিকোণাকার পাখার মত
(গ) পেরিভিসেরাল সাইনাসের প্রাচীরে অবস্থিত
(ঘ) এই পেশির সংখ্যা ৪ জোড়া

৩. ম্যালপিজিয়ান নালিকার দৈর্ঘ্য কত ?
(ক) প্রায় ২২ mm (খ) প্রায় ২৪ mm
(গ) প্রায় ২৫ mm (ঘ) প্রায় ২৬ mm

৪. ওমাটিডিয়ামের কোন অংশ আলো প্রবেশে সাহায্য করে ?
(ক) কর্ণিয়া (খ) ক্রিস্টালাইন কোন কোষ
(গ) কর্ণিয়াজেন কোষ (ঘ) রেটিনুলার কোষ

৫. ভাসা ডিফারেন্সিয়া কত খন্ডকে মিলিত হয় ?
(ক) ৮ম (খ) ৯ম
(গ) ৭ম (ঘ) ১০ম

৬. খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশে সহায়তা করে নিচের কোন অংশ ?
(ক) ক্রপ (খ) মুখছিদ্র
(গ) গলবিল (ঘ) হেপাটিক সিকা

৭. ঘাসফড়িং এর সমগ্র দেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে সময় লাগে–
(ক) ২০ – ৫০ মিনিট (খ) ৪০ – ৫০ মিনিট
(গ) ৩০ – ৬০ মিনিট (ঘ) ৪০ – ৬০ মিনিট

৮. ঘাসফড়িং এর গ্রাসনালি–
i. গলবিলের পিছনে অবস্থিত
ii. সরু ও সোজা
iii. নলাকার পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. ম্যাক্সিলার কাজ–
i. খাদ্য হরণ প্রতিরোধ করে
ii. সংবেদী অংশ হিসাবে কাজ করে
iii. উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. লালারসে যে সকল এনজাইম থাকে–
i. অ্যামাইলেজ ii. প্রোটিয়েজ iii. সেলুলেজ
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. ম্যালপিজিয়ান নালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মত
ii. হলদে বর্ণের অঙ্গাণু
iii. মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. প্রোক্টোডিয়াম–
i. পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ
ii. ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্টি
iii. পাচক রস ক্ষরণ করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি থেকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

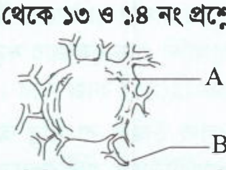

১৩. উদ্দীপকে "B" চিহ্নিত অংশের নাম কি ?
(ক) স্পাইরাকল (খ) ট্রাকিয়া
(গ) ট্রাকিওল (ঘ) বায়ুথলি

১৪. উদ্দীপকে "A" চিহ্নিত অংশের কাজ–
i. দেহকোষে গ্যাসীয় আদান-প্রদান করা
ii. বাতাস জমা রাখা
iii. শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

১. (খ)	২. (খ)	৩. (গ)	৪. (খ)	৫. (খ)
৬. (গ)	৭. (গ)	৮. (ঘ)	৯. (ক)	১০. (খ)
১১. (ঘ)	১২. (ক)	১৩. (খ)	১৪. (গ)	

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রাণী জগতের জন্য শ্বাসকার্য পরিচালনা অপরিহার্য বিষয়। সকল প্রাণী শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিয়মে শ্বসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু ঘাসফড়িং এর শ্বসনতন্ত্র বিশেষ ধরনের এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন।

ক) মোল্টিং কী ? ১
খ) সিলোম ও হিমোসিল এর পার্থক্য লিখ। ২
গ) উদ্দীপকে যে তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা ঘাসফড়িং এর ক্ষেত্রে বর্ণনা কর। ৩
ঘ) "উদ্দীপকে আলোচিত তন্ত্রটি জীবজগতের জন্য অপরিহার্য"– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২.৩ প্রতীক প্রাণী : রুই মাছ (*Labeo rohita*)

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❒ রুই মাছের গঠন	পাঠ ১	রুই মাছের বাহ্যিক গঠন
❒ রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র	পাঠ ২	রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র
❒ ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৩	ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছ ব্যবচ্ছেদ করে এর রক্ত সংবহনতন্ত্র শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ
❒ রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন	পাঠ ৪	রুই মাছের শ্বসনতন্ত্র
❒ ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের ফুলকা ও পটকা (বায়ুথলি) শনাক্তকরণ	পাঠ ৫	রুই মাছের বায়ুথলি
❒ প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক	পাঠ ৬	ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছ ব্যবচ্ছেদ করে শ্বসনতন্ত্র, ফুলকা ও পটকা (বায়ুথলি) শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ
❒ রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব	পাঠ ৭	রুই মাছের প্রজনন ও জীবনচক্র
	পাঠ ৮	রুই মাছের সংরক্ষণ

Cypriniformes বর্গের অন্তর্গত Cyprinidae গোত্রভুক্ত মিঠাপানির প্রায় ৩,০০০ প্রজাতির মাছকে **কার্প** (carp) বা **সিপ্রিনিড** (cyprinid) মাছ বলে। এটি সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যময় মাছের গোত্র (মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবেও সবচেয়ে বড় গোত্র)। স্বাদুপানির যেসব মাছের মাথায় আঁইশ থাকে না কিন্তু সারাদেহ **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত থাকে, দেহগহ্বরে **পটকা** থাকে সেগুলোকে **কার্প জাতীয় মাছ** বলে।

মুখের মধ্যে দাঁতের অনুপস্থিতি, একটি একক পৃষ্ঠীয় পাখনা এবং সংবেদী পার্শ্বীয় রেখার উপস্থিতি দেখে এ গোত্রের সদস্যদের শনাক্ত করা যায়। আকারের ভিত্তিতে কার্প দুরকম, **মেজর কার্প** ও **মাইনর কার্প**।

মেজর/প্রধান কার্পগুলো (major carp) অপেক্ষাকৃত বড় আকারের, যেমন চাইনিজ কার্প (*Aristichthyes nobilis*), গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngodon idella*), সিলভার কার্প (*Hypophthalmicthys molitrix*), এবং বাংলাদেশী প্রধান কার্প রুই (*Labeo rohita*), কাতলা (*Catla catla*), মৃগেল (*Cirrhinus cirrhosus*) প্রভৃতি। এসব মাছ চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট আকারের কার্পগুলোও সিপ্রিনিডি গোত্রের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছ যা **মাইনর কার্প** (minor carps) নামে পরিচিত। নদী-খাল-বিল সব ধরনের জলাধারেই যেসব কার্প চাষ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ভাগনা (*Cirrhinus reba*), বাটা (*Labeo bata*), কালিবাউস (*Labeo calbasu*) প্রভৃতি।

বাংলাদেশের তিনটি (রুই, কাতলা ও মৃগেল) **মেজর কার্প** জাতীয় প্রজাতির মধ্যে **রুই মাছ** (*Labeo rohita*) স্বাদুপানির চাষযোগ্য, সুলভ, জনপ্রিয় ও প্রোটিনসমৃদ্ধ সুস্বাদু মাছ। রুই মাছের অঞ্চলভিত্তিক পরিচিত অপর বাংলা নামগুলো হচ্ছে– **রুহিত, রাউ, গরমা, নওসি** ইত্যাদি। এটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় খামারে বছরে ৩৫–৪৫ সেন্টিমিটার (১–১.৫ ফুট) লম্বা, ৭০০– ৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়। কিন্তু হালদা নদীর রুইয়ের পোনার বৃদ্ধি ২–২½ কেজি পর্যন্ত বাড়ে। এ কারণে হালদা নদীর রুইয়ের রেণু পোনা / ডিম পোনা (৪ দিনের বয়সের পোনা) প্রতি কেজি সর্বনিম্ন ৬০–৬৫ হাজার টাকা (যখন বিপুল পরিমাণ ডিম পাওয়া যায়), সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা। শুধু বৃদ্ধি হারের জন্যই নয়, বিভিন্ন চাষ বা লালন কেন্দ্রগুলোতে অন্তঃপ্রজননের ফলে বামনত্ব, বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন জিনগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় হালদা-র প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ জিনের পোনা এখন আরও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

বসতি (Habitat) : রুই মাছ ইন্ডিয়া (মূল ভূখণ্ড), পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নদীতন্ত্রের প্রাকৃতিক প্রজাতি। স্বাদুপানির পুকুর, নদী, হ্রদ ও মোহনায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বড় নদীতে বিচরণ করে, ডিম ছাড়ার সময় প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। স্বাদ, সহজ চাষপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ও পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে শ্রীলংকা,

RMDAC

নেপাল, চীন, রাশিয়ান ফেডারেশন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলোতে রুই মাছের চাষ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিঠাপানির নদীতেও অনুপ্রবেশিত রুইয়ের সফল চাষ হচ্ছে।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Chordata (জীবনের কোনো না কোনো দশায় নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে)
Subphylum : Vertebrata (নটোকর্ড মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত)
Class : Actinopterygii (অস্থিময় রশ্মিযুক্ত পাখনা)
Order : Cypriniformes (পার্শ্বরেখা সংবেদী অঙ্গ লেজের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত)
Family : Cyprinidae (কার্প মাছ, ভোমার দাঁতবিহীন, গলবিলীয় দাঁত উপস্থিত)।
Genus : *Labeo* (মাংসল ঠোঁট রয়েছে)।
Species : *Labeo rohita*

বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি মেজর ও মাইনর কার্প

মেজর কার্প

Aristichthys nobilis (চাইনিজ কার্প) — *Ctenopharyngodon idella* (গ্রাস কার্প)

Hypophthalmichthys molitrix (সিলভার কার্প) — *Cirrhinus cirrhosus* (মৃগেল)

Labeo rohita (রুই) — *Catla catla* (কাতলা)

মাইনর কার্প

Cirrhinus reba (ভাগনা) — *Labeo calbasu* (কালিবাউস) — *Labeo bata* (বাটা)

স্বভাব (Habit) : জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রুইয়ের পছন্দের আহার হচ্ছে প্ল্যাংকটন জাতীয় (প্রাণিপ্ল্যাংকটন ও উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন) জীব। **আঙুলি পোনা** দশায় (fingerling stage) প্রধানত প্রাণিপ্ল্যাংকটন গ্রহণ করলেও ডেসমিড (desmids), ফাইটোফ্ল্যাজেলেট (phytoflagellate), শৈবাল রেণু (algal spore) প্রভৃতিও গ্রহণ করে। তরুণ ও পূর্ণবয়স্ক মাছ পানির মাঝ স্তরের শৈবাল ও নিমজ্জিত উদ্ভিদ বেশি গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রধানত শাকাশী)। পৌষ্টিকনালিতে পচনশীল জৈব পদার্থ ও বালু, কাদা প্রভৃতি দেখে তলদেশি খাদকও মনে হয়। খুঁটে খাওয়ার উপযোগী নরম ঝালরযুক্ত ঠোঁট এবং

মুখ-গলবিলীয় অঞ্চলে দাঁতের বদলে ধারালো **কর্তন আল** (edge) দেখে বোঝা যায় রুই মাছ নরম জলজ উদ্ভিদ আহার করে। ফুলকায় সরু চুলের মতো **ফুলকা-রেকার** (gill-raker) দেখে প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাছ অতিক্ষুদ্র প্ল্যাংকটনও ছেঁকে খায়। মাছের পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে, বয়স্ক মাছ পৃথক জীবন অতিবাহিত করে। রুই মাছ ১৪° সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না। [DAT-2016-17]

প্ল্যাংকটন (Plankton) : পানিতে মুক্ত ভাসমান অবস্থায় বসবাসকারী এবং স্রোতের অনুকূলে ভেসে বেড়ানো ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক জীবগোষ্ঠীকে **প্ল্যাংকটন** বলে। শৈবাল ও উদ্ভিদ জাতীয় প্ল্যাংকটনগুলোকে **ফাইটোপ্ল্যাংকটন** বা **উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন** বলে, যেমন–*Chlorella, Navicula* ইত্যাদি। অন্যদিকে, প্রোটোজোয়া ও প্রাণী জাতীয় প্ল্যাংকটনগুলোকে **জুওপ্ল্যাংকটন** বা **প্রাণিপ্ল্যাংকটন** বলে, যেমন– *Paramecium, Daphnia* ইত্যাদি।

Labeo rohita-র বাহ্যিক গঠন

রুই (*Labeo rohita*) একটি অস্থিময় মাছ। এর দেহ অনেকটা মাকু আকৃতির অর্থাৎ মধ্যভাগ চওড়া ও দু'ই প্রান্ত ক্রমশ সরু। প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা বেশি, প্রস্থচ্ছেদ ডিম্বাকার। চলনের সময় পানির ভিতর গতি বাধা পায়না বলে এ ধরনের আকৃতিকে **স্ট্রিমলাইন্ড** (streamlined) বলে। রুই মাছের দেহ তিন অংশে বিভক্ত, যথা–**মাথা, দেহকাণ্ড** ও **লেজ**।

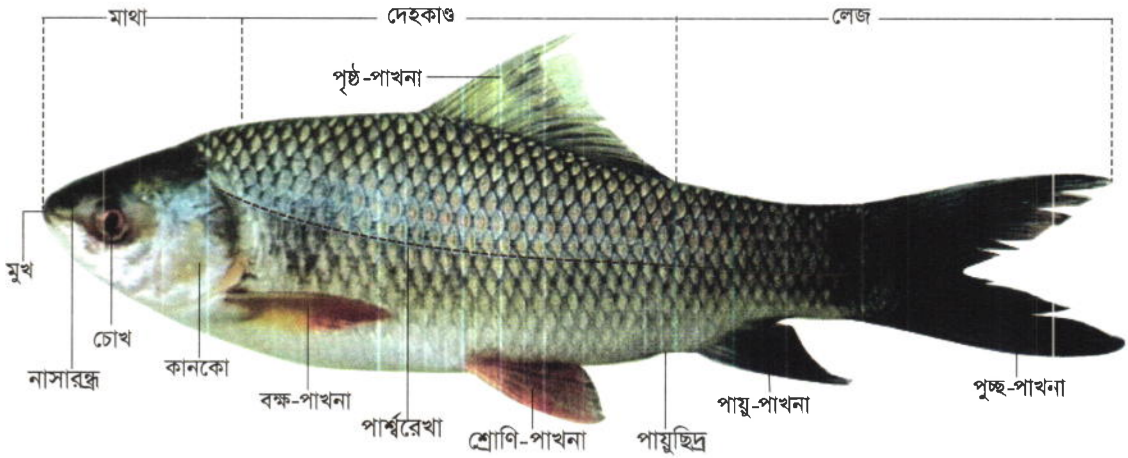

চিত্র ২.৩.১ : *Labeo rohita*-র বাহ্যিক গঠন (পার্শ্ব দৃশ্য)

১. মাথা (Head)

দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে কানকোর পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত অংশটি **মাথা**। মাথা ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও পৃষ্ঠভাগ উত্তল। **তুণ্ড** (snout) ভোঁতা, নিচু, কিন্তু চোয়ালের সামনে বাড়ানো এবং কোনো পার্শ্বীয় খণ্ডবিহীন। মুখ অর্ধচন্দ্রাকার, নিচের দিকে উপপ্রান্তীয়ভাবে (subterminal) অবস্থিত ও আড়াআড়ি বিস্তৃত এবং মোটা ঝালরের মতো ঊর্ধ্ব ও নিম্নোষ্ঠে আবৃত। ঊর্ধ্বচোয়ালের পিঠের দিকে একজোড়া নরম ও ছোট **ম্যাক্সিলারি বার্বেল** (maxillary barbels) থাকে। তুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে দুচোখের একটু সামনে একজোড়া **নাসারন্ধ্র** (nostrils) অবস্থিত। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রের পিছনে ও মাথার দুপাশে একটি করে বড় গোল **চোখ** রয়েছে। চোখে পাতা থাকে না, কিন্তু কর্ণিয়া স্বচ্ছ ত্বকীয় আবরণে আবৃত। মাথা আঁইশবিহীন, দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত।

মাথার পিছন দিকে দুপাশে ফুলকা-প্রকোষ্ঠকে ঢেকে অবস্থান করে দুটি বেশ বড় ও পাতলা **কানকো** (operculum)। কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে পাতলা **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** (branchiostegal membrane) যুক্ত থাকে, এটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠের বড় অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।

২. দেহকান্ড (Trunk)

কানকোর শেষভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত দেহের মধ্য অংশটি **দেহকাণ্ড**। এ অংশটি চওড়া এবং বিভিন্ন ধরনের **পাখনা** (fin) বহন করে। পাখনাগুলো পূর্ণ বিকশিত ও অস্থিময় **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) যুক্ত। দেহকাণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তের অঙ্কীয়দেশে ঠিক মাঝ বরারব তিনটি ছোট ছিদ্র থাকে : প্রথমে **পায়ুছিদ্র,** মাঝে **জননছিদ্র** এবং সবশেষে **রেচনছিদ্র**।

দেহের দুপাশে একসারি ক্ষুদ্র গর্ত আছে যা আঁইশের নিচে অবস্থিত একটি লম্বা খাদের সঙ্গে যুক্ত। এ খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে মাছের **পার্শ্বরেখা** অঙ্গ (lateral line organ) গঠিত হয়। এতে অবস্থিত **সংবেদী কোষ** পানির তরঙ্গ থেকে পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদ গ্রহণ করে।

পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনাঙ্গকে **পাখনা** বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা-রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভিতরে অবস্থিত সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম শলাকার অন্তঃকঙ্কালকে **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়। এর মধ্যে বক্ষ ও শ্রোণি-পাখনা জোড় প্রকৃতির অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং পৃষ্ঠীয়, পায়ু ও পুচ্ছ-পাখনা বিজোড় প্রকৃতির।

জোড়-পাখনা

বক্ষ-পাখনা (Pectoral fin) : কানকোর ঠিক পিছনে দেহকাণ্ডের সম্মুখ পার্শ্বদিকে একজোড়া **বক্ষ-পাখনা** রয়েছে। প্রত্যেক পাখনা ১৬-১৭টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত। এ পাখনা মাছকে পানির গভীর থেকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে।

শ্রোণি-পাখনা (Pelvic fin) : একজোড়া **শ্রোণি-পাখনা** বক্ষ-পাখনার সামান্য পিছনে অবস্থিত এবং ৯টি করে পাখনা-রশ্মিযুক্ত। এসব পাখনা মাছকে উপরে ও নিচের দিকে চলতে, দ্রুত ঘুরতে ও থামতে সাহায্য করে।

বিজোড়-পাখনা

পৃষ্ঠ-পাখনা (Dorsal fin) : দেহকাণ্ডের মাঝ বরাবরের পিছনে বড়, কিছুটা রম্বস আকৃতির একটি মাত্র **পৃষ্ঠ-পাখনা** অবস্থিত। এর উপরের দিকের মধ্যভাগ অবতল। এতে ১৫-১৬টি পাখনা-রশ্মি থাকে। পৃষ্ঠ-পাখনা মাছকে উল্টে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং এটি মাছকে হঠাৎ ঘুরতে ও থেমে যেতে সাহায্য করে।

পায়ু-পাখনা (Anal fin) : পায়ুর ঠিক পিছনে দেহের অঙ্কীয়দেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি **পায়ু-পাখনা** থাকে। এটি ৭টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত। এটি মাছকে সাঁতারের সময় সুস্থিত রাখতে সাহায্য করে।

পুচ্ছ-পাখনা (Caudal fin) : লেজের পিছনে অবস্থিত পাখনাটি **পুচ্ছ-পাখনা**। এতে আছে ১৯টি পাখনা-রশ্মি। পুচ্ছ-পাখনা রুই মাছের **প্রধান চলন অঙ্গ** হিসেবে কাজ করে। (**)

৩. লেজ (Tail)

পায়ুর পরবর্তী অংশটি লেজ (মেরুদণ্ডী প্রাণীর পায়ুর পিছনের কশেরুকা সমৃদ্ধ অংশকে **লেজ** বলে)। এর শীর্ষে রয়েছে **হোমোসার্কাল** (homocercal) ধরনের পুচ্ছ-পাখনা। এটি উল্লম্বতলে (vertical plane) প্রসারিত এবং পিছনে, উপরে ও নিচে দুটি প্রতিসম বাহ্যিক খণ্ডে বিভক্ত। ডার্মাল রশ্মিগুলো উপরে ও নিচের খণ্ডে বড়, মাঝখানে ছোট।

আঁইশ (Scales)

রুই মাছের দেহত্বক যে সব পাত-সদৃশ পাতলা অস্থিময় গঠনে আবৃত, সেগুলোকে **আঁইশ** বলে। মাছের সমগ্র দেহকাণ্ড ও লেজ পাতলা, রুপালি চকচকে গোল বা ডিম্বাকার, মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত থাকে। [MAT: 2018-19] পৃষ্ঠদেশীয় আঁইশের কেন্দ্র লালচে, প্রান্ত কালো রংয়ের। কেন্দ্রের লালচে রং জনন ঋতুতে আরও গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়। জলচর উদ্ভিদসমৃদ্ধ পরিবেশের রুই মাছে পৃষ্ঠদেশের রং লালচে-সবুজ হতে পারে। আঁইশগুলো ত্বকের **ডার্মাল স্তর** (dermal layer) থেকে সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি আঁইশ **ডার্মাল পকেট** (dermal pocket)-এর মধ্যে বসানো থাকে। টালীর ছাদে টালী যেমন একে অপরকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখে, আঁইশগুলোও তেমনি সাজানো থাকে। রাসায়নিকভাবে আঁইশগুলো **চুন** ও **কোলাজেন তন্তু** দিয়ে গঠিত।

আঁইশের কেন্দ্রভাগ পুরু এবং কিনারার দিক ক্রমশ পাতলা। এর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ অংশ থাকে। একে **ফোকাস বা নিউক্লিয়াস** (focus or nucleus) বলে। ফোকাসের চারদিকে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকারে সজ্জিত উঁচু আলের মতো কতকগুলো রেখা থাকে, এ রেখাগুলোকে **সারকুলি** (circuli; একবচনে circulus) বলে এবং এগুলো অস্থি উপাদানে গঠিত। সারকুলির মধ্যে কয়েকটি রেখা বেশ স্পষ্ট ও মোটা হয়ে থাকে। এগুলোকে **বার্ষিক বৃদ্ধি রেখা** (annual growth ring) বা **অ্যানুলি** (annuli; একবচনে annulus) বলে। এগুলোর সাহায্যে মাছের বয়স ও বৃদ্ধিহার নির্ণয় করা যায়। সাধারণত বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয়। [MAT: 2016-17]

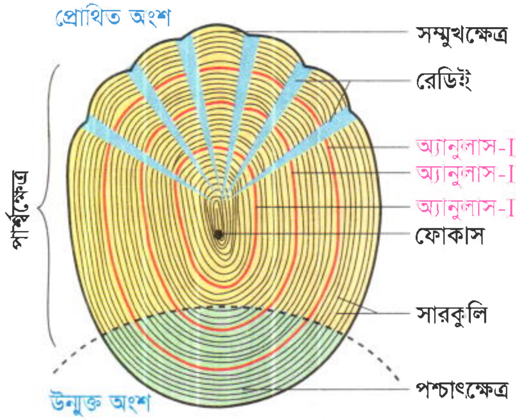

চিত্র ২.৩.২ : রুই মাছের আঁইশ

প্রতিটি আঁইশে নিচে বর্ণিত তিনটি **ক্ষেত্র** (field) দেখা যায়।

1. **সম্মুখক্ষেত্র (Anterior field) :** এটি আঁইশের তন্তুময় **যোজক টিস্যু** নির্মিত **সম্মুখ ভাগ** যা ডার্মিসের পকেটে প্রবিষ্ট থাকে।
ii. **পশ্চাৎক্ষেত্র (Posterior field) :** এটি আঁইশের **ডেন্টিন-নির্মিত** পশ্চাৎভাগ যা বাইরের দিকে উন্মুক্ত থাকে।
iii. **পার্শ্বক্ষেত্র (Lateral field) :** এটি আঁইশের দুপাশের অংশ।

আঁইশের সম্মুখক্ষেত্রে কতকগুলো লম্বালম্বি খাঁজ দেখা যায়। এগুলোকে **রেডিই** (radii) বলে।

আঁইশের কাজ : (i) আঁইশ মাছের প্রধান প্রতিরক্ষাকারী অঙ্গ। (ii) মাছের চলাচলে পানির বাধা কমাতে সহায়তা করে। (iii) এতে বিদ্যমান মিউকাস বিভিন্ন রোগজীবাণু ধ্বংস করে। (iv) পার্শ্বরেখায় অবস্থিত আঁইশগুলো পানির কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে সংবেদ গ্রহণে সাহায্য করে। (v) এরা মাছের শ্রেণিবিন্যাস, বয়স ও বৃদ্ধিহার, জীবন ইতিহাস ইত্যাদি নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে। All

Labeo rohita-র রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

রক্তবাহিকাবিস্তৃত এবং হৃৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এ তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। রুই মাছের রক্ত সংবহন **বদ্ধ প্রকৃতির**। এতে **একবর্তনী** বা **একচক্রী রক্ত সংবহন** দেখা যায়।

i. **একবর্তনী বা একচক্রী রক্ত সংবহন (Single Circuit Blood Circulation) :** যে সংবহনে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে O_2-সমৃদ্ধ বা CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত একটি চক্রে আবর্তিত হয়, তাকে **একবর্তনী** বা **একচক্রী** রক্ত সংবহন বলে। যেমন– মাছের রক্ত সংবহন।
ii. **দ্বিবর্তনী বা দ্বিচক্রী রক্ত সংবহন (Double Circuit Blood Circulation) :** যে সংবহনে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে O_2-সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত দুটি পৃথক চক্রে আবর্তিত হয়, তাকে **দ্বিবর্তনী** বা **দ্বিচক্রী** রক্ত সংবহন বলে। যেমন–মানুষের রক্ত সংবহন।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপাদানসমূহ (Components of Blood Circulatory System)

রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র প্রধান তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা–**রক্ত, হৃৎপিণ্ড** এবং **রক্তনালি**। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. রক্ত (Blood)

রুই মাছের রক্ত লাল বর্ণের। **রক্তরস** ও **রক্তকণিকা** নিয়ে এটি গঠিত। রক্তরস হালকা হলুদ বর্ণের এবং পানি ও বিভিন্ন অজৈব ও জৈব উপাদানে গঠিত। রক্তরসে দুধরনের রক্তকণিকা ভাসমান থাকে, যথা-**লোহিত রক্তকণিকা** ও **শ্বেত রক্তকণিকা**। লোহিত রক্তকণিকা ডিম্বাকার, নিউক্লিয়াসযুক্ত, হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ এবং লাল বর্ণের। শ্বেত রক্তকণিকা অ্যামিবয়েড, নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং বর্ণহীন।

২. হৃৎপিণ্ড (Heart)

রুই মাছের ফুলকাদুটির পিছনে লম্বাটে ও মোচাকৃতির হৃৎপিণ্ড **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** (pericardial cavity) নামে এক বিশেষ ধরনের গহ্বরে অবস্থান করে। **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium) নামক শক্ত আবরণে হৃৎপিণ্ড আবৃত থাকে। অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডও দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট–একটি **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) এবং অন্যটি **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle)। এছাড়া এতে **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। নিচে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন উপ-প্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠের বর্ণনা দেওয়া হলো।

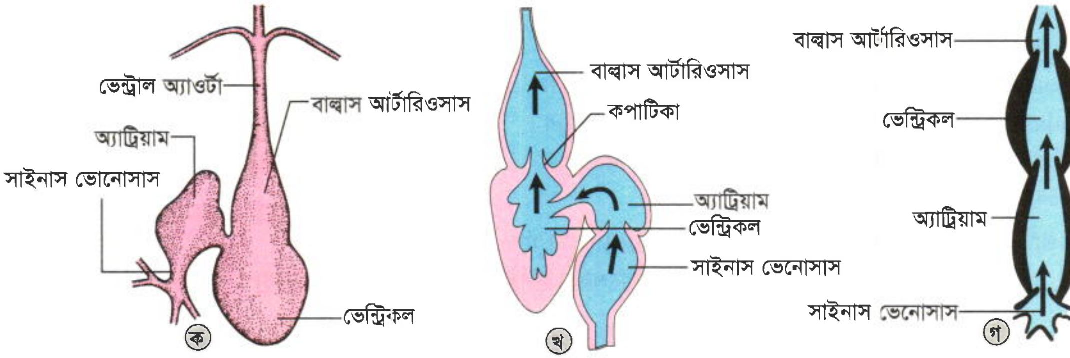

চিত্র ২.৩.৩ : *Labeo*-র হৃৎপিণ্ড; (ক) বহির্গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ, (গ) রেখাচিত্র; ⟶ = রক্ত প্রবাহের দিক

- **সাইনাস ভেনোসাস :** এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট উপপ্রকোষ্ঠ যা হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। সাইনাস ভেনোসাস প্রকৃত পক্ষে শিরাতন্ত্রের অংশ এবং এর প্রাচীরের টিস্যু হৃৎপেশি দিয়ে গঠিত নয়। দেহের দু'পাশ থেকে আগত **ডাক্টাস ক্যুভিয়েরি** (ductus Cuvieri) নামক দুটি বড় শিরার মিলনে সাইনাস ভেনোসাস সৃষ্টি হয়। এতে শিরারক্ত জমা হয়। এটি **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল** (sino-atrial) ছিদ্রপথে অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে শিরা থেকে সংগৃহীত CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।
- **অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) :** এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত ত্রিকোণাকার, পেশিময় ও পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস ভেনোসাস অন্যদিকে **অ্যাট্রিও–ভেন্ট্রিকুলার** (atrio-ventricular) ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত।
- **ভেন্ট্রিকল (নিলয়) :** এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয়-পশ্চাৎদেশে অবস্থিত এ প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং সম্মুখে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** (bulbus arteriosus)-এ উন্মুক্ত। ভেন্ট্রিকল রক্তচাপ সৃষ্টি করে এবং ফুলকায় রক্ত প্রেরণ করে।

বাল্বাস আর্টারিওসাস : রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে **কোনাস আর্টারিওসাস** (conus arteriosus) নেই। তার পরিবর্তে বাল্বাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত গোড়াদেশীয় অংশ। এটি হৃৎপিণ্ডের কোন অংশ নয়। হৃৎপিণ্ড থেকে এটি ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (Heart Valves)

হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ ছিদ্রে **কপাটিকা** (valve) থাকে। কপাটিকাগুলো শুধু সামনের দিকে উন্মুক্ত হয়, ফলে রক্তের পশ্চাৎগতি রুদ্ধ হওয়ায় রক্তের প্রবাহ থাকে একমুখি। বিপরীত প্রবাহে কপাটিকাগুলো বাধা দেয়। রুই মাছের হৃৎপিন্ডে নিচে বর্ণিত কপাটিকাগুলো পাওয়া যায়।

- **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকা (Sino-atrial valve) :** সাইনাস ভেনোসাস ও অ্যাট্রিয়ামের মাঝে অবস্থিত ছিদ্রপথে এ কপাটিকা থাকে।
- **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা (Atrio-ventricular valve) :** অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের মাঝে অবস্থিত অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথে এ কপাটিকা অবস্থান করে।
- **ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা (Ventriculo-bulbus valve) :** এটি ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস অ্যাওর্টার মাঝে অবস্থিত কপাটিকা।

৩. রক্ত নালি (Blood Vessels)

রুই মাছের রক্তনালি তিন প্রকার, যথা-**ধমনি, শিরা** এবং **কৈশিকজালিকা**। ধমনিগুলোর সমন্বয়ে **ধমনিতন্ত্র** এবং শিরাগুলোর সমন্বয়ে **শিরাতন্ত্র** গঠিত হয়। ধমনি ও শিরার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কৈশিকজালিকা। এছাড়া **রেটিয়া মিরাবিলিয়া** (retia mirabilia) এবং **অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) নামক কিছু বিশেষ ধরনের রক্তনালিও থাকে।

রুই মাছের ধমনিতন্ত্র (Arterial System)

যেসব রক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপত্তি লাভ করে কৈশিকজালিকায় সমাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে তাদেরকে **ধমনি** (artery) বলে। ধমনির সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে **ধমনি তন্ত্র** বলে। অন্যান্য প্রাণী থেকে মাছের ধমনিতন্ত্র একটু ভিন্ন ধরনের। সে হিসেবে রুই মাছের ধমনিতন্ত্র উভচর বা সরীসৃপ থেকে ভিন্নতর। **অন্তর্বাহী** বা **অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি, বহির্বাহী** বা **ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি, পৃষ্ঠীয় মহাধমনি** ও এর শাখাপ্রশাখা রুই মাছের ধমনিতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো–

ক. অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Afferent Branchial Artery) : যেসব রক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড থেকে প্রবাহিত রক্ত ফুলকায় সরবরাহ করে সেগুলোকে **অন্তর্বাহী** বা **অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** বলে। রুই মাছে **চার জোড়া** অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি থাকে। রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে **কোনাস আর্টারিওসাস** না থাকায় ভেন্ট্রিকল থেকে ধমনিতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত **অঙ্কীয় মহাধমনি** বা **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta)-র মাধ্যমে সম্মুখে কিছুটা প্রবাহিত হয়। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার গোড়া ফুলে উঠে একটি অসঙ্কোচনশীল **বাল্বাস অ্যাওর্টা** গঠন করে। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা গলবিলের তলদেশ দিয়ে হাইওয়েড (hyoid) পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দুপাশে শাখা সৃষ্টি করে। প্রথম শাখাদুটি উভয় পাশের প্রথম ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে। ঐ শাখাকে **প্রথম অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** বলে। উক্ত শাখাদুটির পিছন দিকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা থেকে উভয়দিকে পৃথকভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বেরিয়ে যথাক্রমে প্রতিপাশের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে রুই মাছে প্রতি পাশে চারটি করে মোট চারজোড়া **অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে টাকী মাছে (*Channa punctatus*) ৩য় ও ৪র্থ অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি পরস্পরকে ঘিরে যে প্যাঁচের সৃষ্টি করে তেমনটি রুই মাছের নেই।

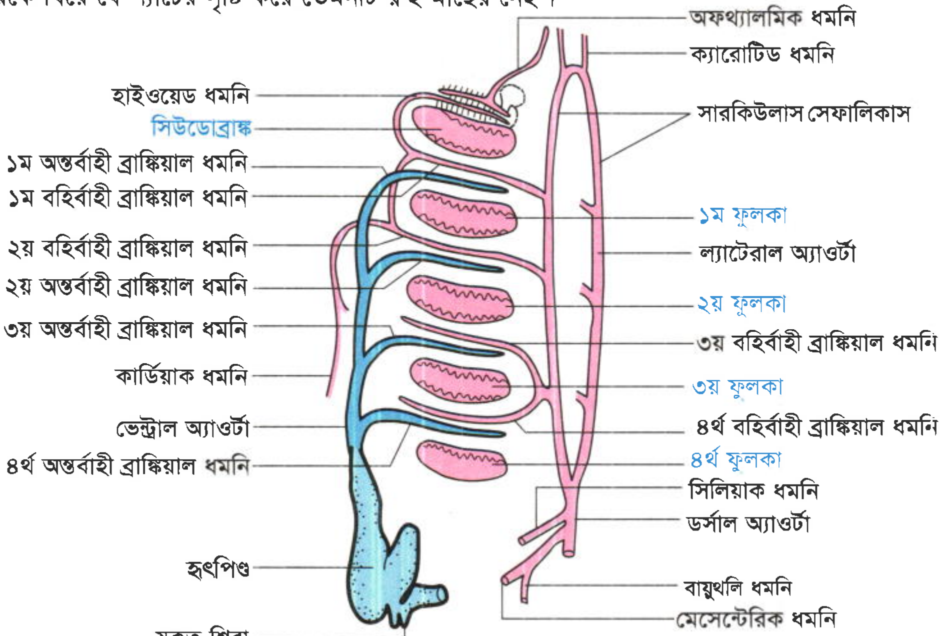

চিত্র ২.৩.৪ : *Leabeo*-র অন্তর্বাহী (▬) ও বহির্বাহী (▭) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (এক পাশের দৃশ্য)

RMDAC

খ) **বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Efferent Branchial Artery) :** চারজোড়া ফুলকা থেকে চারজোড়া **বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির** সৃষ্টি হয়। প্রথম বহির্বাহী ধমনি অঙ্কীয়দেশে হাইওয়েড আর্চের সিউডোব্রাঙ্কে রক্ত বহন করে এবং সিউডোব্রাঙ্কের সামনে **অফথ্যালমিক মহাধমনি** (ophthalmic artery) হিসেবে বিস্তৃত হয়। প্রতি পাশের ১ম ও ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি মিলে লম্বালম্বি **পার্শ্বীয় মহাধমনি** বা **ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা** (lateral aorta) গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি ল্যাটেরাল আওর্টায় উন্মুক্ত হওয়ার আগে একসাথে মিলিত হয়। ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা সামনে **ক্যারোটিড ধমনিরূপে** বিস্তৃত হয় এবং করোটিকার ভিতরে প্রবেশ করে।

গ. **পৃষ্ঠীয় মহাধমনি বা ডর্সাল অ্যাওর্টা (Dorsal Aorta) :** দুপাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা পিছনে একীভূত হয়ে **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (dorsal aorta) গঠন করে এবং পিছন দিকে বিস্তৃত হয়। দুপাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলে গলবিল অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে একটি ডিম্বাকার **ধমনি বলয়** সৃষ্টি করে। এর নাম **সারকিউলাস সেফালিকাস** (circulus cephalicus)।

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি নিম্নোক্ত প্রধান নালিকাগুলো সৃষ্টি করে : ***

১. **সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি (Subclavian artery) :** বক্ষ-পাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়। [DAT: 2020-21]

২. **সিলিয়াকো-মেসেন্টেরিক ধমনি (Coeliaco-mesenteric artery) :** পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক অঙ্গে রক্ত পরিবহন করে।

৩. **প্যারাইটাল ধমনি (Parietal artery) :** দেহপ্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে।

৪. **রেনাল ধমনি (Renal artery) :** বৃক্কে রক্ত বহন করে।

৫. **ইলিয়াক ধমনি (Iliac artery) :** শ্রোণি-পাখনায় রক্ত পরিবহন করে।

৬. **কডাল ধমনি (Caudal artery) :** লেজে রক্ত সরবরাহ করে।

রুই মাছের শিরাতন্ত্র (Venous System)

কৈশিকজালিকা (blood capillaries) থেকে সৃষ্টি হয়ে, যেসব রক্তবাহিকা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে **অক্সিজেনবিহীন** (deoxygenated) রক্ত সংগ্রহ করে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে নিয়ে আসে, সেগুলোই সম্মিলিতভাবে **শিরাতন্ত্র** গঠন করে। রুইমাছের শিরাতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-**১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** এবং **২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (Systemic Venus System) :** যেসব শিরা দিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। সিস্টেমিক শিরা নিয়ে গঠিত হয় **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র**। একজোড়া **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা**, একজোড়া **জুগুলার শিরা** ও একজোড়া **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** রুই মাছের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে। দেহের সামনের অংশ থেকে **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা** ও **জুগুলার শিরা** রক্ত সংগ্রহ করে সেপাশের **ডাক্টাস ক্যুভিয়েরি** (ductus Cuvieri)-তে উন্মুক্ত হয়। পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দেহের পশ্চাৎভাগ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এবং সেপাশের ডাক্টাস ক্যুভিয়েরিতে

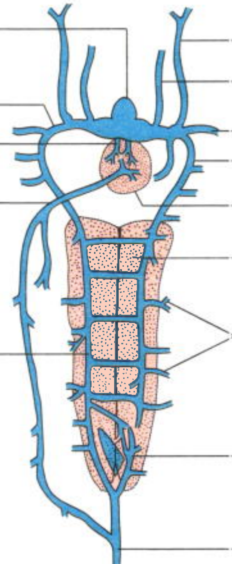

চিত্র ২.৩.৫ : রুই মাছের শিরাতন্ত্র

উন্মুক্ত হয়। উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা **সেগমেন্টাল শিরা, রেনাল শিরা, জেনিটাল শিরা** ইত্যাদি থেকেও রক্ত গ্রহণ করে। উভয় ডাক্টাস ক্যুভিয়েরি হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে মুক্ত হয়। প্রতিপাশের বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা থেকে **সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা** রক্ত সংগ্রহ করে ডাক্টাস ক্যুভিয়েরির মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রেরণ করে। তাছাড়া ডান ও বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কয়েকটি অনুপ্রস্থ শিরা দিয়ে যুক্ত থাকে। এগুলোকে **অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) বলে।

২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal System) : কৈশিকনালিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে অক্সিজেনহীন রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যে সব শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিকনালিতে পরিণত হয়, সেগুলোকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরা নিয়ে **পোর্টাল শিরাতন্ত্র** গঠিত হয়।

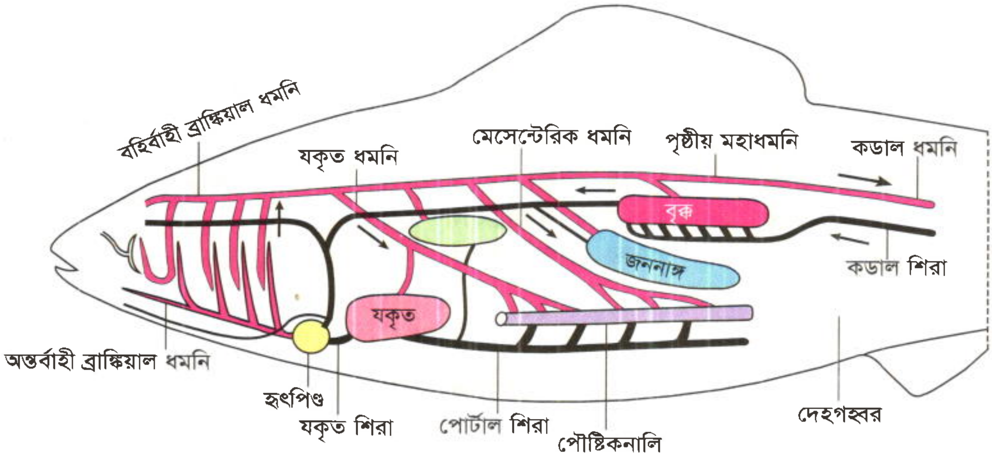

চিত্র ২.৩.৬ : রুই মাছের দেহে রক্ত সংবহন

হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র ও **রেনাল পোর্টালতন্ত্র** নিয়ে রুই মাছের পোর্টালতন্ত্র গঠিত।

❑ **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র (Hepatic portal system) :** **হেপাটিক** বা **যকৃত পোর্টাল শিরা** পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে প্রবেশ করে সেখানে শাখায় বিভক্ত হয়ে রক্তজালক সৃষ্টি করে। **যকৃত শিরা** (hepatic vein) এই রক্তজালক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সরাসরি সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত হয়।

❑ **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র (Renal portal system) :** দেহের লেজ অঞ্চল থেকে **কডাল শিরা** (caudal vein) রক্ত সংগ্রহ করে দেহকাণ্ডে প্রবেশ করে এবং দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ডান শাখাটি **ডান পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** হিসেবে সামনে অগ্রসর হয়, বাম শাখাটি বৃক্কে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। একে **রেনাল পোর্টাল শিরা** বলে। বৃক্ক থেকে রক্ত বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দিয়ে সংগৃহীত হয়ে ডাক্টাস ক্যুভিয়েরির মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায়।

এক নজরে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া

সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টারিওসাস → ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা

↑ ডাক্টাস ক্যুভিয়েরি

একচক্রী সংবহন

↓ অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (CO_2-যুক্ত রক্ত) ↓

শিরাতন্ত্র ← দেহের অঙ্গসমূহ ← বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (O_2-যুক্ত রক্ত) ← ফুলকা

চিত্র ২.৩.৭ : রুই মাছের দেহে রক্ত প্রবাহের গতিপথ

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন

সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড রক্ত পরিবহন করে। কপাটিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রক্ত সংবহনের **একমুখিতা** দেখা যায় এবং এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **এক চক্রী হৃৎপিণ্ড** (single circuit heart) বলে। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাহিত হওয়ায় রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে **ভেনাস হার্ট** (venous heart) বা **শিরা হৃৎপিণ্ড** বলে।

[DAT: 2018-19]

হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত একমুখী প্রবাহে O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুলকায় প্রেরিত হয় এবং ফুলকা থেকে সারাদেহ হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। একটি ছন্দোময় তালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঙ্কুচিত হয়। প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসে সঙ্কোচন ঘটে। পরে ক্রমশ অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টারিওসাস সঙ্কুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিবার সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) বলে। সিস্টোলের পরপরই হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বলে **ডায়াস্টোল** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

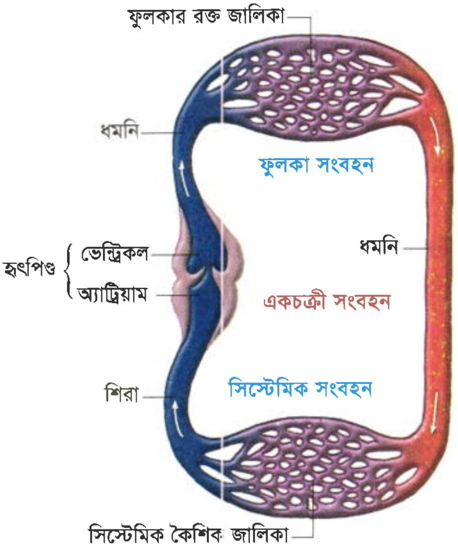

চিত্র ২.৩.৮ : হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন

রক্তের গতিপথ : সাইনাস ভেনোসাস ⟶ অ্যাট্রিয়াম ⟶ ভেন্ট্রিকল ⟶ বাল্বাস আর্টারিওসাস ⟶ ফুলকা

রুই মাছ ও মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	রুই মাছের হৃৎপিণ্ড	মানুষের হৃৎপিণ্ড
১. আকৃতি	নলাকৃতি।	মোচাকৃতি।
২. হৃৎপ্রাচীর	হৃৎপ্রাচীর পেরিকার্ডিয়াম নামে পরিচিত। এতে কোন বিভেদিত স্তর থাকে না এবং হৃৎপেশি নির্মিত।	হৃৎপ্রাচীর এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়াম নামক তিন স্তরে বিভেদিত। এন্ডোকার্ডিয়াম হৃৎপেশি নির্মিত।
৩. প্রকোষ্ঠ	দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট-একটি অ্যাট্রিয়াম ও একটি ভেন্ট্রিকল।	চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট-দুটি অ্যাট্রিয়াম ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৪. উপ-প্রকোষ্ঠ	এতে **সাইনাস ভেনোসাস** নামক একটি উপ-প্রকোষ্ঠ থাকে।	এতে কোনো উপ-প্রকোষ্ঠ থাকে না।
৫. বাল্বাস আর্টারিওসাস	ভেন্ট্রিকল থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার উৎপত্তি হয়। এর গোড়ায় **বাল্বাস আর্টারিওসাস** নামক একটি স্ফীত অংশ থাকে।	বাম ভেন্ট্রিকল থেকে সিস্টেমিক অ্যাওর্টার এবং ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি অ্যাওর্টার উৎপত্তি হয়। এতে বাল্বাস আর্টারিওসাস থাকে না।
৬. শিরা	এর উপ-প্রকোষ্ঠে **ডাক্টাস ক্যুভিয়েরি** নামক দুটি বড় শিরা উন্মুক্ত থাকে।	এর ডান অ্যাট্রিয়ামে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা, ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও করোনারি সাইনাস নামক তিনটি বড় শিরা এবং বাম অ্যাট্রিয়ামে চারটি ছোট পালমোনারি শিরা উন্মুক্ত থাকে।
৭. রক্ত সংবহন	এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত অর্থাৎ শিরা রক্ত বাহিত হয়, তাই একে **ভেনাস হার্ট** বলে। এতে **একচক্রী** রক্ত সংবহন ঘটে।	এর মধ্য দিয়ে O_2-সমৃদ্ধ এবং CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত অমিশ্রিতভাবে বাহিত হয়। অর্থাৎ এতে **দ্বিচক্রী** রক্ত সংবহন ঘটে।
৮. সমন্বয়	এটি ফুলকার সাথে সমন্বয় করে রক্ত সংবহন করে।	এটি ফুসফুসের সাথে সমন্বয় করে রক্ত সংবহন করে।

ব্যবহারিক

রুই মাছের বাহ্যিক গঠন পর্যবেক্ষণ

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata
Class : Actinopterygii
Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : *Labeo*
Species : *Labeo rohita* (রুই মাছ)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, উদর অনেকটা গোলাকার।
২. মস্তক বড় ও তুন্ড ভোঁতা।
৩. মস্তকের অগ্রপ্রান্তে অর্ধডিম্বাকার মুখছিদ্র অবস্থিত।
৪. চোখ ও কানকো চওড়া।
৫. একজোড়া সরু, পাতলা ম্যাক্সিলারি বার্বেল উপস্থিত।
৬. একজোড়া বক্ষ-পাখনা, একজোড়া শ্রোণি-পাখনা, একটি পৃষ্ঠ-পাখনা ও একটি অঙ্কীয়-পাখনা থাকে।
৭. পুচ্ছ-পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের।

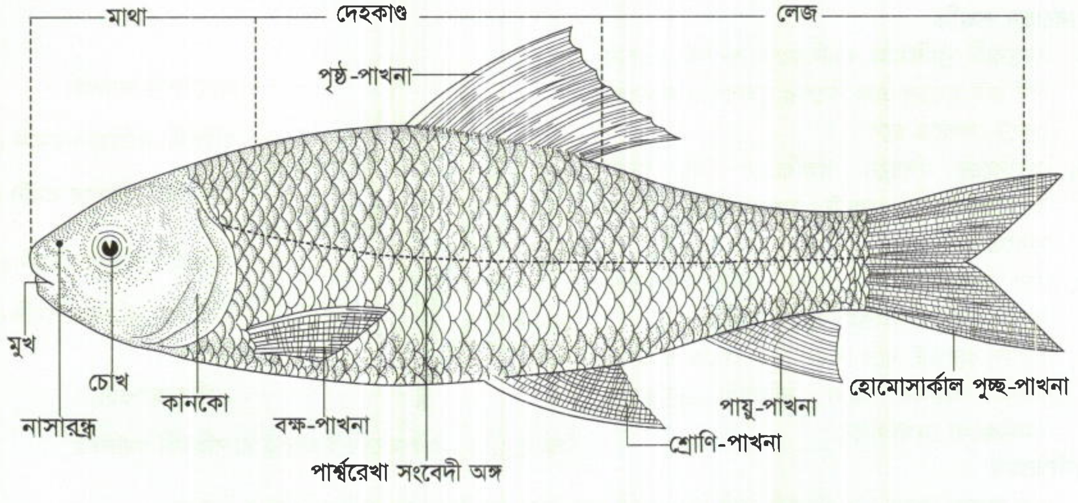

চিত্র ২.৩.৯ : *Labeo rohita* (রুই মাছ)-এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)

রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ক. রুই মাছের (*Labeo*-র) অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. একটি রুই মাছকে চিৎ করে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে রেখে সাবধানে বক্ষ-অক্ষিচক্র কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।

২. দেহের তলদেশীয় প্রান্তের ত্বক ও পেশি কেটে ফেলতে হবে।

৩. পেরিকার্ডিয়াম কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করতে হবে।

৪. এবার হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ প্রান্ত থেকে **অঙ্কীয় মহাধমনি** বা **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta)-র উৎপত্তি অনুসরণ করে পেশি কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

৫. এ প্রক্রিয়ায় অঙ্কীয় মহধমনির উভয় পাশে চারটি করে অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি দেখা যাবে।

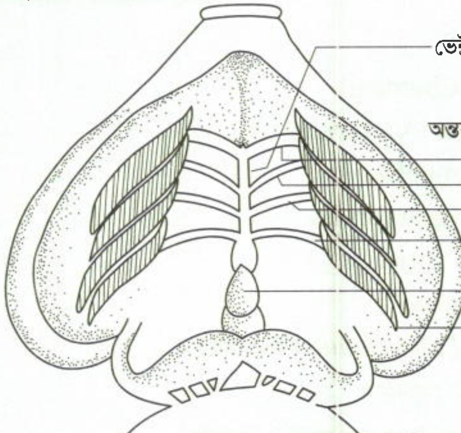

চিত্র ২.৩.১০ : রুই মাছের অ্যাফারেন্ট বা অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

পর্যবেক্ষণ

১. হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ ভাগ থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা উৎপন্ন হয়ে সোজা সামনের দিকে প্রসারিত হয়েছে।

২. **১ম অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** (বাম ও ডান) : ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার অগ্রপ্রান্তের বিভক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে ১ম ফুলকা জোড়ায় প্রবেশ করেছে।

৩. **২য় অন্তর্বাহী ধমনি :** ১ম জোড়ার কিছুটা পিছন থেকে উৎপন্ন হয়ে ২য় ফুলকা জোড়ায় প্রবেশ করেছে।

৪. **৩য় অন্তর্বাহী ধমনি :** ২য় জোড়ার পিছন থেকে উৎপন্ন হয়ে ৩য় ফুলকা জোড়ায় প্রবেশ করেছে।

৫. **৪র্থ অন্তর্বাহী ধমনি :** ৩য় জোড়ার পিছন থেকে উৎপন্ন হয়ে ৪র্থ ফুলকা জোড়ায় প্রবেশ করেছে।

খ. রুই মাছের বহির্বাহী বা ইফারেন্ট (Efferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিগুলো শনাক্ত হওয়ার পর রুই মাছের এক পাশের ফুলকা ও কানকো কেটে ফেলতে হবে।

২. হৃৎপিণ্ডের পিছনে গলবিলের নিচ দিয়ে আড়াআড়িভাবে কেটে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করতে হবে।

৩. খুব সাবধানে মুখগহ্বরের ঝিল্লি অপসারণ করলে **ডর্সাল অ্যাওর্টা** উন্মুক্ত হবে।

৪. ডর্সাল অ্যাওর্টা ধরে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হলে বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিগুলো দেখা যাবে।

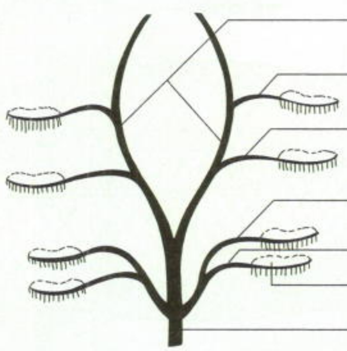

চিত্র ২.৩.১১ : রুই মাছের ইফারেন্ট বা বহির্বাহী ধমনিতন্ত্র

পর্যবেক্ষণ

১. ১ম ফুলকা থেকে ১ম বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বের হয়ে ল্যাটেরাল অ্যাওর্টাতে মিলিত হয়েছে।

২. এর কিছুটা পিছনে অবস্থিত ২য় ফুলকা থেকে ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি উৎপন্ন হয়ে ল্যাটেরাল অ্যাওর্টাতে মিলিত হয়েছে।

৩. একইভাবে ৩য় ও ৪র্থ ফুলকা থেকে যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বের হয়ে একত্রে মিলিত হওয়ার পর ডর্সাল অ্যাওর্টাতে প্রবেশ করেছে।

৪. দু'পাশে ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা পিছন দিকে মিলিত হয়ে ডর্সাল অ্যাওর্টা গঠন করেছে।

Labeo rohita-র শ্বসনতন্ত্র

যে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় জীবের জীবন্ত কোষগুলো পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, গৃহীত O_2 দিয়ে কোষ মধ্যস্থ খাদ্যকে জারিত করে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে CO_2 পরিবেশে মুক্ত করে তাকে শ্বসন (respiration) **বলে**। যেসব অঙ্গের মাধ্যমে জীবের শ্বসনকার্য পরিচালিত হয় সেগুলো মিলিতভাবে **শ্বসনতন্ত্র** গঠন করে।

শ্বসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা– **বহিঃশ্বসন** ও **অন্তঃশ্বসন**। বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে ও পরিবেশে CO_2 ত্যাগ করে। অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় কোষে গৃহীত O_2 দিয়ে খাদ্য জারিত হয় এবং CO_2, পানি ও শক্তি উৎপন্ন হয়। রুই মাছ জলজ প্রাণী হওয়ায় এরা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। **ফুলকা** (gill) রুই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্গ।

ফুলকা (gill) : রুই মাছের মাথার পিছন দিকে কানকো দিয়ে ঢাকা যে **চারজোড়া শ্বাস অঙ্গ** থাকে, সেগুলোকে **ফুলকা** বলে। প্রত্যেক ফুলকা দেখতে চিরুনির মতো এবং দুই সারি **ফুলকা সূত্র** (gill filament) বহন করে। প্রত্যেক ফুলকা দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অর্ধাংশকে বলে **হেমিব্রাঙ্ক** (hemibranch; অর্ধফুলকা) এবং দুটি হেমিব্রাঙ্ক নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ ফুলকাকে বলে **হোলোব্রাঙ্ক** (holobranch; পূর্ণ ফুলকা)। প্রত্যেক হেমিব্রাঙ্ক একসারি করে ফুলকা সূত্র বহন করে। এগুলো গোড়ায় একটি অতিখর্ব আন্তঃফুলকা ব্যবধায়কে যুক্ত, শীর্ষে মুক্ত। এ ধরনের ফুলকাকে **ফিলিফরম** (filiform) বা **পেক্টিনেট** (pectinate) ফুলকা বলে। প্রত্যেক ফুলকা সূত্র ক্ষুদ্রাকায় অনেক অনুপ্রস্থ প্লেট বা **ল্যামেলি** (lamellae) বহন করে। ল্যামেলিগুলো কৈশিকজালিকা-সমৃদ্ধ পাতলা এপিথেলিয়ামে আবৃত। প্রত্যেক ল্যামেলামের একপাশ দিয়ে **অন্তর্বাহী ধমনি** (afferent artery) ও অন্যপাশ দিয়ে **বহির্বাহী ধমনি** (efferent artery) বিস্তৃত হয়।

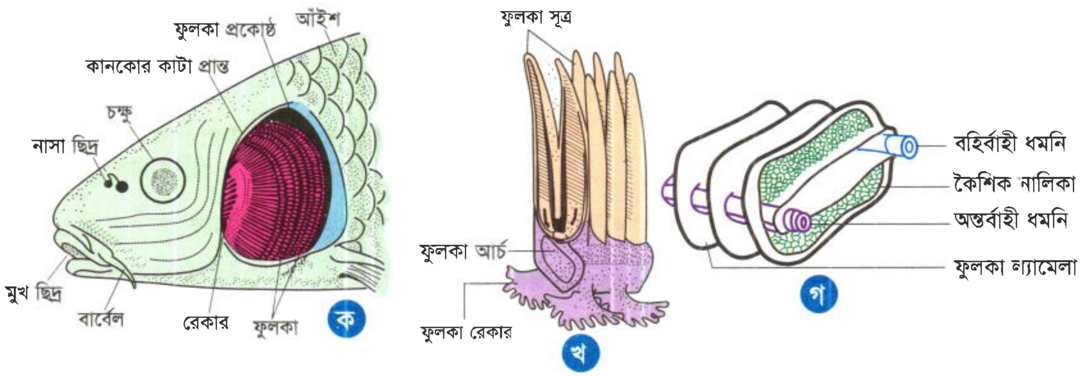

চিত্র ২.৩.১২ : *Labeo*-র (ক) বামপাশের ফুলকা; (খ) ফুলকার একাংশ; (গ) ফুলকার রক্তনালি

রুই মাছের গলবিলের দুপাশে দুটি **ফুলকা প্রকোষ্ঠ** (gill chamber) থাকে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ৪টি করে মোট **চার জোড়া ফুলকা** অবস্থান করে। অস্থিময় **অপারকুলাম** (operculum) বা **কানকো** দিয়ে ফুলকাগুলো ঢাকা থাকে। কানকোর পশ্চাৎপ্রান্তে একটি পেশল, নরম **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** (branchiostegal membrane) থাকে। প্রত্যেক ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাইরের দিকে একটি বৃহৎ অর্ধাচন্দ্রাকার **বহিঃফুলকা ছিদ্র** দিয়ে উন্মুক্ত। ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা বহিঃফুলকা ছিদ্রকে বন্ধ বা খুলতে পারে। গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে পাঁচ জোড়া **অন্তঃফুলকা ছিদ্র** থাকে। এসব ছিদ্রের মধ্যবর্তী গলবিলের প্রাচীর অস্থিনির্মিত এবং দেখতে আর্চের মতো (ধনুকাকৃতি)। এগুলোকে **ফুলকা আর্চ** (gill arch) বলে। গলবিলের প্রতি পাশে পাঁচটি করে ফুলকা আর্চ থাকে। প্রথম চারটি ফুলকা আর্চে একটি করে ফুলকা অবলম্বিত থাকে। পঞ্চম ফুলকা আর্চ কোনো ফুলকা বহন করে না। হাইওয়েড আর্চের হ্রাসপ্রাপ্ত ফুলকা বা **সিউডোব্রাঙ্কিয়া** (pseudobranchea) কানকোর ভিতরের দিকে একটি চাকের মতো লেগে থাকে। এতে মাত্র একসারি ফুলকা সূত্র থাকে। ফুলকা আর্চের ভিতরের দিকে গলবিল প্রাচীর থেকে কয়েকটি ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এদের **ফুলকা রেকার** (gill raker) বলে। এগুলো ফুলকাছিদ্রে খাদ্য প্রবেশে বাধা দিয়ে ছাকনি হিসেবে কাজ করে।

শ্বসন কৌশল (Mechanism of Respiration)

রুই মাছে দুই ধাপে শ্বাসক্রিয়া ঘটে-- **শ্বাসগ্রহণ** ও **শ্বাসত্যাগ**। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ **চোষণ পাম্প** (suction pump) হিসেবে কাজ করে।

১. **শ্বাসগ্রহণ বা পানির অন্তঃপ্রবাহ বা প্রশ্বাস (Inspiration) :** হাইপোব্রাঙ্কিয়াল বা হাইপোগ্লোসাল পেশি, হাইওয়েড আর্চ ও ফুলকা আর্চের ক্রিয়ায় গলবিল ও মুখ গহ্বরের প্রসারণ ঘটে। এ সময় ফুলকা আর্চ বাইরের দিকে প্রসারিত হয় এবং মুখের সামনে অবস্থিত কপাটিকা খুলে যায়। মুখ গহ্বরের প্রকোষ্ঠের আয়তন বেড়ে যাওয়ায় O_2-সমৃদ্ধ পানি বাইরের পরিবেশ থেকে মুখছিদ্রের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বর ও গলবিলে প্রবেশ করে এবং ফুলকা প্রকোষ্ঠের ফুলকাগুলোকে পানিসিক্ত করে। এ সময় কানকো সংলগ্ন ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা দেহের বহির্গাত্রের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে থেকে বহিঃফুলকা ছিদ্রকে বন্ধ করে রাখে।

২. **শ্বাসত্যাগ বা পানির বহিঃপ্রবাহ বা নিঃশ্বাস (Expiration) :** এ পর্যায়ে মুখগহ্বর ও গলবিলের সঙ্কোচনের ফলে আগে প্রসারিত প্রকোষ্ঠ আয়তনে কমে যায় এবং পানির উপর চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে পানি ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা খুলে বহিঃফুলকা ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। এসময় **মৌখিক কপাটিকা** (oral valve) মুখছিদ্রকে বন্ধ করে রাখে বলে ঐ পথে পানি বাইরে যেতে পারে না।

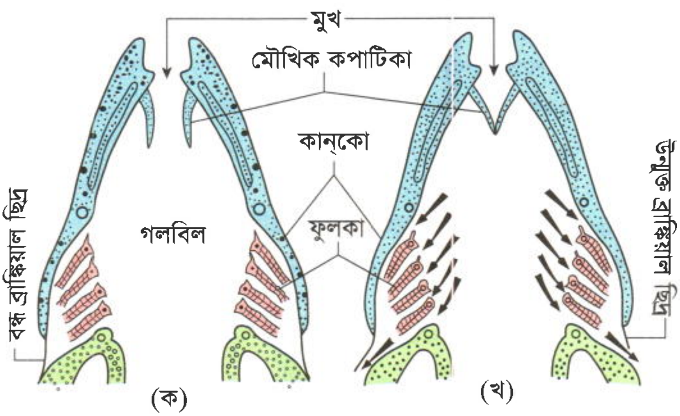

চিত্র ২.৩.১৩ : *Labeo*-র শ্বসন কৌশল : (ক) প্রশ্বাস; (খ) নিঃশ্বাস। তীরচিহ্ন পানির গতি নির্দেশক

আনুষঙ্গিক শ্বসন অঙ্গ (Accessory Respiratory Organ) : বলতে গেলে, রুই মাছে অতিরিক্ত কোন শ্বসন অঙ্গ নেই। তবে কৈশিকজালিকা-সমৃদ্ধ **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** এবং **পটকা** শ্বসনে কিছু সহায়তা করে।

শ্বসনের শারীরতত্ত্ব (Physiology of Respiration)

অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বয়ে এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিকজালকে ছেড়ে দেয়। এসময় শ্বাস গ্রহণকালে নেয়া O_2-সমৃদ্ধ পানি ফুলকা সূত্রকের উপর দিয়ে বয়ে গেলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। রক্ত পানিতে CO_2 ত্যাগ করে ও পানি থেকে O_2 গ্রহণ করে। O_2-সমৃদ্ধ রক্ত তখন বহিঃফুলকা ধমনির সাহায্যে গৃহীত হয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিস্রোত তন্ত্র (Counter current system) : রুই মাছের ফুলকায় অবস্থিত রক্ত নালিকার মধ্য দিয়ে রক্ত অবিরাম পানিস্রোতের বিপরীতে প্রবাহিত হয়। একে **প্রতিস্রোত তন্ত্র** বলে। এতে রক্তে সর্বোচ্চ অক্সিজেন (৮০%) গ্রহণ নিশ্চিত হয়। বিপরীতমুখী পানিস্রোতে রক্ত থেকে বেশি ঘনত্বে অক্সিজেন থাকায় এটি ঘটে। একটি দীর্ঘস্থায়ী ঘনত্ব নতিমাত্রা (concentration gradient) সৃষ্টি হওয়ায় পানির অক্সিজেন খুব সহজেই রক্তে দ্রবীভূত হয়। ফুলকায় বিদ্যমান ল্যামিলিগুলো অক্সিজেনের শোষণতল বাড়িয়ে দেয়। ফুলকা সূত্রকের প্রান্তভাগ পরস্পরকে অতিক্রম করে। ফলে ফুলকা প্রকোষ্ঠে পানি প্রবাহের গতি মন্থর থাকে যাতে গ্যাস বিনিময়কাল দীর্ঘ হয়।

বায়ুথলি বা সন্তরণ থলি বা পটকা বা হাইড্রোস্ট্যাটিক অঙ্গ
(Air/Swim Bladder or Hydrostatic Organ)

রুই মাছসহ অধিকাংশ অস্থিময় মাছের দেহগহ্বরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট, বায়ুপূর্ণ, চকচকে সাদা বর্ণের থলির মতো একটি গঠনকে **বায়ুথলি** বলে। এটি মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থান করে। মূলত গলবিলের পৃষ্ঠপ্রাচীর থেকে একটি অভিক্ষেপ আকারে এটি সৃষ্টি হয়। এতে যে গ্যাস রয়েছে তার অধিকাংশই O_2, তবে সামান্য পরিমাণে N_2 ও CO_2 থাকে। সিলিয়াকো মেসেন্টেরিক ধমনির শাখা বায়ুথলিতে রক্ত সরবরাহ করে এবং বায়ুথলি থেকে যকৃত পোর্টাল শিরায় যোগদানকারী শিরা দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

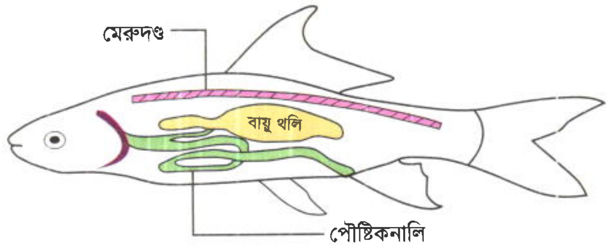

চিত্র ২.৩.১৪ : মাছের দেহে বায়ুথলির অবস্থান

রুই মাছের বায়ুথলি একটি গভীর খাঁজ দিয়ে দুটি অসম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে– সামনের প্রকোষ্ঠটি ছোট আর পিছনেরটি বড়। অন্ননালি ও বায়ুথলির মাঝে একটি সংযোগকারী নালি থাকে। একে **নিউম্যাটিক নালি** (pneumatic duct) বা **ডাক্টাস নিউমেটিকাস** (ductus pneumaticus) বলে। যেসব বায়ুথলি নালিপথে অন্ননালির সাথে যুক্ত থাকে সেসব বায়ুথলিকে **ফাইসোস্টোমাস** (physostomous) বায়ুথলি বলে। রুই, কাতলা, পুটি ইত্যাদি মাছে ফাইসোস্টোমাস ধরনের বায়ুথলি পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, যেসব বায়ুথলি অন্ননালির সাথে যুক্ত থাকে না সেগুলোকে বলে **ফাইসোক্লিস্টাস** (physoclistus) **বায়ুথলি**। টাকি, কই ইত্যাদি মাছে ফাইসোক্লিস্টাস ধরনের বায়ুথলি পাওয়া যায়। বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসিন্নিবিষ্ট রক্তজালকসমৃদ্ধ। এর প্রাচীর দ্বিস্তরবিশিষ্ট, বাইরে যোজক টিস্যু নির্মিত **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica externa) এবং ভিতরের মসৃণ পেশি নির্মিত **টিউনিকা ইন্টার্না** (tunica interna)।

বায়ুথলির উভয় প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়ামে একটি করে লাল রঙের **গ্যাসগ্রন্থি** থাকে। এর নাম **রেটি মিরাবিলি** (একবচন rete-mirabile; বহুবচন retia mirabilia)। রেটি মিরাবিলি মূলত ঘনসন্নিবিষ্ট কৈশিকজালিকার গুচি। অগ্র প্রকোষ্ঠের গ্যাস গ্রন্থি রক্ত থেকে গ্যাস শোষণ করে বায়ুথলিতে ক্ষরণ করে। অন্যদিকে, পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠের গ্যাসগ্রন্থি বায়ুথলি থেকে গ্যাস শোষণ করে রক্তে প্রেরণ করে।

রুই মাছের বায়ুথলি কতকগুলো ক্ষুদ্র অস্থি দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে অন্তঃকর্ণের সাথে যুক্ত। আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী **আর্নেস্ট হেনরিচ ভেবার** (Ernst Heinrich Weber)-এর নামানুসারে এসব অস্থিকে **ভেবেরিয়ান অসিকল** (Weberian ossicles; জার্মান ভাষায় W এর উচ্চারণ V এর মতো) বলে। এ সংযোগ দিয়ে বায়ুথলিতে গ্যাসের পরিবর্তিত চাপ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে পরিবাহিত হয় যা মাছের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

বায়ুথলির কাজ

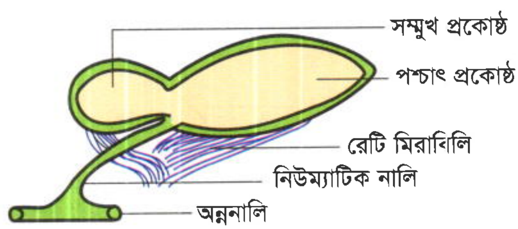

চিত্র ২.৩.১৫ : রুই মাছের বায়ুথলির গঠন

১. **প্লবতা রক্ষা :** বায়ুথলি প্লবতা রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এটি ভিতরের গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **অভিযোজনক্ষম ভাসন্ত :** বায়ুথলি মাছের ভাসন্ত অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। পানির যেকোনো গভীরতায় বায়ুথলি পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশ উপযোগী হতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে সাঁতারে সহায়তা করে।

৩. **শ্বসন :** বায়ুথলি O_2 এর আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানিতে O_2 এর ঘাটতি দেখা দিলে বায়ুথলিতে উপস্থিত গ্যাস সে ঘাটতি পূরণ করে মাছের শ্বসনে সাহায্য করে।

৪. **প্রতিধ্বনি সৃষ্টি :** বায়ুথলি পানিতে উৎপন্ন শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে যা **ভেবেরিয়ান অসিকল** দিয়ে অন্তঃকর্ণে পৌঁছালে মাছ শব্দ শুনতে পায়।

৫. শব্দ উৎপাদন : বায়ুথলি শব্দ উৎপাদনেও সহযোগিতা করে। বায়ুথলির নিউম্যাটিক নালি দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস শব্দ উৎপাদন করে। কোনো কোনো মাছের বায়ুথলির প্রাচীর প্রয়োজনে প্রকম্পিত হয়ে হিস্ হিস্, ঘোৎ ঘোৎ বা ঢাকের শব্দের মতো আওয়াজ সৃষ্টি করে। এভাবে এরা শত্রুকে ভয় দেখায় এবং যৌন সঙ্গীকে আকৃষ্ট করে।

৬. চাপ নিয়ন্ত্রণ : পানিতে বিভিন্ন গভীরতায় ওঠা-নামা করার সময় মাছের দেহে চাপের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে বায়ুথলি চাপ গ্রাহক ও নিয়ন্ত্রক অঙ্গ হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়।

বায়ুথলির শ্রেণিতাত্ত্বিক গুরুত্ব (Taxonomic significance of air bladder)

বায়ুথলি মাছের শ্রেণিবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রাসনালি ও বায়ুথলির মধ্যে সংযোগকারী নালির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে **টেলিওস্ট** (Teleosts) মাছদের দুটি প্রধান দলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন–

১. **ফাইসোসটমি** (Physostomy) : গ্রাসনালি ও বায়ুথলির মধ্যে সংযোগকারী নালি ডাক্টাস নিউমেটিকাস বিদ্যমান। উদাহরণ-রুই, কাতলা ইত্যাদি।

২. **ফাইসোক্লিস্টি** (Physoclesty) : গ্রাসনালি ও বায়ুথলির মধ্যে সংযোগকারী নালি ডাক্টাস নিউমেটিকাস পরিণত মাছে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ-টাকি, কই ইত্যাদি।

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই মাছের ফুলকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছ নিয়ে এর এক পাশের কানকো বা অপারকুলামটি সাবধানে কেটে ফেললে ফুলকা উন্মুক্ত হবে।

পর্যবেক্ষণ

১. **ফুলকা** (gill) হচ্ছে রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ। এটি গাঢ় লাল বর্ণের এবং এর এক প্রান্ত চিরুনির দাঁতের মতো সূক্ষ্মভাবে চেরা। প্রত্যেক ফুলকা দুটি অনুরূপ অর্ধাংশ দিয়ে গঠিত।

২. কানকো দিয়ে আবৃত প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠতে চারটি করে ফুলকা পর পর সজ্জিত থাকে।

৩. গলবিলের প্রাচীরের দুদিকে পাঁচটি করে **ফুলকা ছিদ্র** থাকে। ছিদ্রগুলো **ফুলকা আর্চ** (gill arch) দিয়ে বিভক্ত।

৪. প্রত্যেক ফুলকা আর্চের ভিতরের অবতল প্রান্তে দাঁতের মতো **ফুলকা রেকার** এবং বাইরের উত্তল প্রান্তে দুই সারি **ফুলকা সূত্র** (gill filament) থাকে।

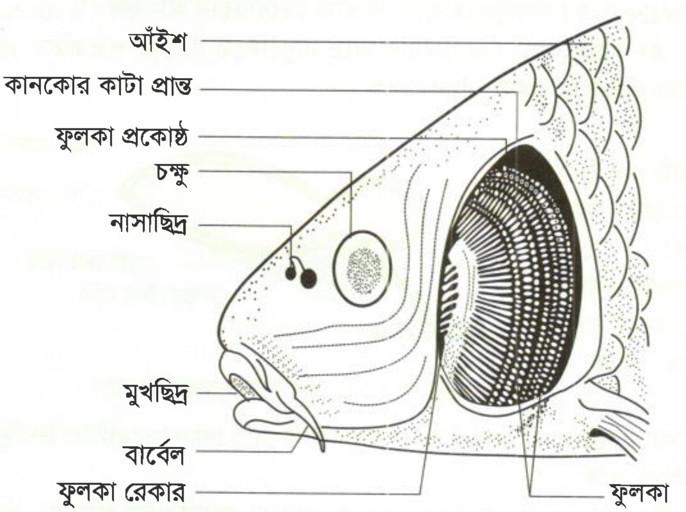

চিত্র ২.৩.১৬ : রুই মাছের ফুলকা

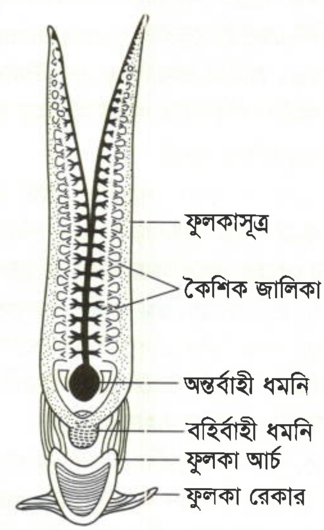

চিত্র ২.৩.১৭ : রুই মাছের ফুলকা সূত্র

২. রুই মাছের বায়ুথলি বা পটকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. একটি রুই মাছ চিৎ করে ট্রের উপর রেখে লেজ ও কানকোর দিকে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে।

২. স্ক্যালপেলের সাহায্যে পেটের দিকে ছিদ্র করে লম্বালম্বিভাবে পায়ু থেকে গলবিল পর্যন্ত চিরে মাংসপেশি ও ত্বক কেটে নিতে হবে।

৩. গলবিল অঞ্চলের পেশি কেটে ফেলতে হবে।

৪. পরিপাক নালি, পরিপাক গ্রন্থিসহ দেহাভ্যন্তরের অন্যান্য অংশ অপসারণ করলে **পটকা** দেখা যাবে।

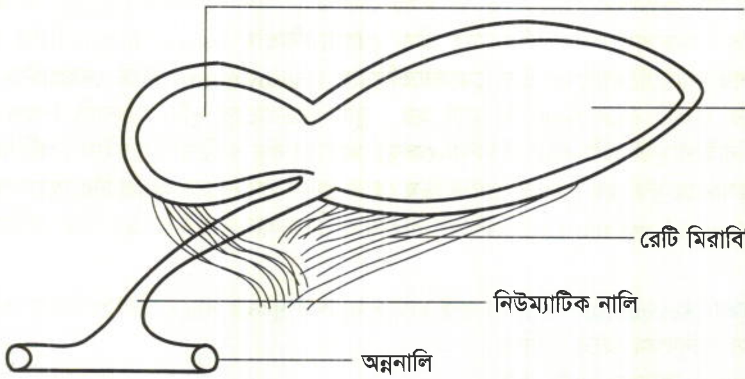

চিত্র ২.৩.১৮ : রুই মাছের বায়ুথলি

পর্যবেক্ষণ

১. পাকস্থলির উপরের প্রান্তে পটকাটি পাকস্থলির সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

২. একটি গভীর খাঁজ দিয়ে পটকা দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত–ছোট **সম্মুখ প্রকোষ্ঠ** এবং বড় **পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ**।

৩. বায়ু থলিটি বাতাসে পূর্ণ।

৪. **নিউম্যাটিক নালি** (pneumatic duct) নামক সরু নালির সাহায্যে পটকাটি অন্ননালির সাথে যুক্ত।

রুই মাছ ও মানুষের শ্বসন অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ	মানুষের শ্বসন অঙ্গ
১. শ্বসন অঙ্গের নাম	রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ **ফুলকা**।	মানুষের শ্বসন অঙ্গ **ফুসফুস**।
২. অভিযোজন	ফুলকা জলীয় শ্বসনের জন্য অভিযোজিত।	ফুসফুস স্থলজ শ্বসনের জন্য অভিযোজিত।
৩. সংখ্যা ও অবস্থান	ফুলকাগুলো চিরুনি আকারের, সংখ্যায় ৪ জোড়া, গলবিলের দুপাশে দুটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠে সমান সংখ্যায় অবস্থান করে।	ফুসফুস স্পঞ্জি থলির মতো, সংখ্যায় ২টি, বক্ষ গহ্বরে ডায়াফ্রামের উপরে অবস্থান করে।
৪. একক	প্রত্যেক ফুলকা সূত্র অনেকগুলো **ল্যামেলি** নিয়ে গঠিত হয়।	প্রত্যেক ফুসফুস অসংখ্য **অ্যালভিওলাই** বা বায়ুথলি নিয়ে গঠিত হয়।
৫. এককের গঠন	ল্যামেলিগুলো ক্ষুদ্র, চ্যাপ্টা প্লেটের মতো এবং রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ পাতলা এপিথেলিয়ামে আবৃত।	অ্যালভিওলাইগুলো ক্ষুদ্র থলির মতো এবং রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ পাতলা এপিথেলিয়ামে আবৃত।
৬. আবরণ	প্রতিটি ফুলকার চারদিকে পৃথক কোনো আবরণ থাকে না।	প্রতিটি ফুসফুস **প্লুরা** নামক একটি আবরণে আবৃত থাকে।
৭. O_2 গ্রহণ	ফুলকাগুলো পানির দ্রবীভূত O_2 গ্রহণের জন্য উপযোগী।	ফুসফুস বায়ুমণ্ডলের মুক্ত O_2 গ্রহণের জন্য উপযোগী।

রুই মাছের প্রজনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and Life-history)

স্রোতবিহীন বদ্ধ জলাশয় যেমন-পুকুর, হাওড়, বাওড়, দীঘি, হ্রদ ইত্যাদিতে রুই মাছ কখনো ডিম পাড়ে না। রুই মাছের সার্থক প্রজননের জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক পরমাণ অক্সিজেন, তাপমাত্রা ও খাদ্য সমন্বিত, স্রোত ও ঘোলা এবং শত্রুমুক্ত আদর্শ পরিবেশ যেখানে এরা নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়তে পারে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পরিপক্ক ডিমগুলো দেহে শোষিত হয়। এ ঘটনাকে **অ্যাটরেশিয়া** (atresia) বলে। নিচে রুই মাছের প্রজননের ধাপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : জনন ঋতুতে **জনন অঙ্গ** বা **গোনাড** (gonad) পূর্ণ বিকশিত হয়। পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা **শুক্রাশয়** (testis) ও স্ত্রী মাছে একজোড়া লম্বা **ডিম্বাশয়** (ovary) পটকার নিচে উদরীয় গহ্বরের পিছনে শায়িত। শুক্রাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোরকিয়াম** (mesorchium) ঝিল্লি দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। ডিম্বাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোভেরিয়াম** (mesovarium) দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে **শুক্রনালি** সৃষ্টি হয়। দুটি শুক্রাশয়ের দুটি শুক্রনালি পিছন দিকে এক হয়ে **রেচন-জনন রন্ধ্র** পথে বাইরে মুক্ত। স্ত্রী মাছে ডিম্বাশয়-জোড়া আকারে বড় ও ডিম্বনালিবিহীন। পরিপক্ক ডিম্বাশয় থেকে জনন ঋতুতে **ডিম** দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। এখান থেকে ডিম রেচন-জনন সাইনাসের অগ্রপ্রাচীর থেকে অস্থায়ীভাবে গঠিত একজোড়া **জনন রন্ধ্র** (genital aperture) পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। রুই মাছের ডিম পরিমিত **কুসুম** (yolk) সমৃদ্ধ।

২. যৌন পরিপক্বতা (Sexual maturity) : রুই মাছ সাধারণত দুবছর বয়সে জননক্ষম হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে আগে ৩ বছর বয়সে জননক্ষম হতো। কিন্তু অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) কারণে এখন রুই মাছে এক বছর বয়সেই জনন ঘটে। জুন-জুলাই মাসের দিকে এরা বংশবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। সাধারণত স্ত্রী মাছ ৫১–৭০ সেমি এবং পুরুষ মাছ ৬০-৬৫ সেমি. লম্বা হলে জননক্ষম হয়।

৩. প্রজনন ঋতু (Breeding season) : প্রকৃতিতে রুই মাছ বছরে একবার জনন সম্পন্ন করে। সাধারণত বর্ষাকালে (জুন-জুলাই) এদের প্রজননের উপযুক্ত সময়। কারণ এসময় জলাশয়ের স্রোতময় ঘোলা পানি পোনা মাছের বেঁচে থাকার উপযুক্ত।

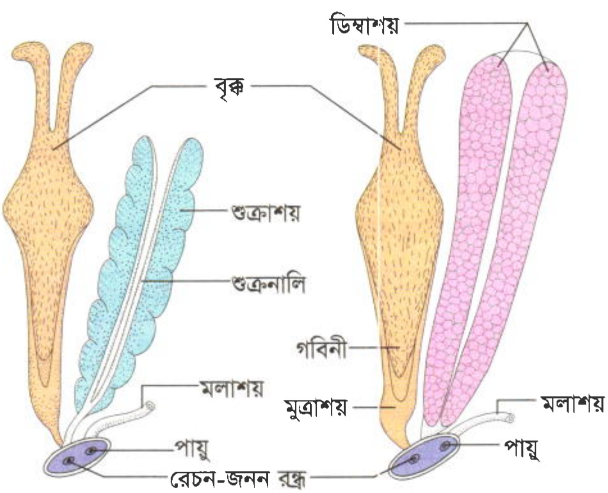

চিত্র ২.৩.১৯ : *Labeo*-র রেচন-জনন তন্ত্র (বায়ে-পুরুষ ও ডানে-স্ত্রী)

৪. প্রজনন স্থান (Breeding place) : রুই মাছ প্রাকৃতিকভাবে স্বাদু পানির স্রোতজ জলাশয়ে বিশেষ করে বড় বড় নদীতে প্রজনন ঘটায় অর্থাৎ ডিম ছাড়ে। পুকুর, হাওড়, বাওড়, বিল ইত্যাদি বদ্ধ জলাশয়ে এরা ডিম ছাড়ে না।

৫. পরিযান বা অভিপ্রয়াণ (Migration): ডিম ছাড়ার সময় এরা ছোট ছোট নদীনালা, খাল, বিল থেকে স্বাদু পানির বড় বড় নদীতে পরিযায়ী হয়। যেহেতু এদের পরিযান শুধু স্বাদু পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই এদের পরিযান **প্রোটামোড্রমাস** (protamodromous) ধরনের।

৬. ডিম ছাড়ার সময় (Liberation of eggs) : প্রজননের সময়ে যৌন পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী রুই মাছ নদীর স্রোতের বিপরীতে পরস্পরের গা ঘেঁসে ছোটাছুটি ও পানি তোলপাড় করে পূর্বরাগ প্রদর্শন করে। ছোটাছুটির সময় মূলত পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছকে অনুসরণ করে। বর্ষাকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বজ্রপাতসহ প্রবল বর্ষণ, উজানের পাহাড়ি ঢল, তীব্র স্রোত ও ফেনিল ঘোলা পানিতে রুই মাছ ঝাঁক বেধে নদীর অগভীর অংশে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সময় পানির তাপমাত্রা ২৪-২৮°C থাকে এবং পানিতে প্রচুর পরিমাণ O_2 থাকে। পানিতে বেশি O_2-এর উপস্থিতি রুই মাছের যৌন

বিশিষ্ট মৎস্যবিজ্ঞানী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মনজুরুল কিবরিয়ার হাতে হালদা নদী থেকে উদ্ধারকৃত ২৫ কেজি ওজনের ও ১০ বছর বয়সি মৃত কাতলা মা-মাছ।

সদ্য সংগৃহিত নিষিক্ত ডিম

প্রজনন মৌসুমে রুইজাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহের দৃশ্য

গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। এ সময় পুরুষ ও স্ত্রীমাছের ছোটাছুটি ও রিওট্যাক্সিসের আবেশীয় প্রভাবে স্ত্রীমাছ হঠাৎ দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে পানিতে একবারে অসংখ্য ডিম ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মাছ ডিমের উপর প্রচুর পরিমাণ **শুক্ররস** (spermatic fluid) ছেড়ে দেয়। ডিম ছাড়া ও শুক্রাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে **স্পনিং** (spawning) বলে। মাত্র ১৫ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক প্রজনন ঋতুতে রুই মাছের ডিম উৎপাদনের ক্ষমতাকে **ফিকান্ডিটি** (fecundity) বা **উর্বরতা** বলে। প্রতি কেজি ওজনের রুই মাছের ফিকান্ডিটি ১–৪ লক্ষ। অর্থাৎ এককেজি ওজনের একটি রুই মাছ এক ঋতুতে ১–৪ লক্ষ ডিম উৎপাদন করতে পারে।

৭. নিষেক (Fertilization) : রুই মাছে **বহিঃনিষেক** ঘটে অর্থাৎ পানিতে শুক্রাণুগুলো ডিম্বাণুগুলোকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম গোল লালচে বর্ণের হয়। রুই মাছের নিষিক্ত ডিম্বাণু পানিতে ভাসে না, পানির তলায় ডুবে যায়। এমন ডিমকে **ডিমারসাল** (demersal) ডিম বলে। [সামুদ্রিক মাছের ডিমগুলো আকারে ছোট, হালকা ও আঠালো আবরণবিহীন এবং নিষেকের পর পানিতে ভেসে থাকে বলে এগুলোকে **পেলাজিক ডিম** (pelagic egg) বলে।]

রুই মাছের জীবন চক্র (Life cycle)

ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন (Development of Embryo) : রুই মাছের জাইগোটের ব্যাস ৪.১-৪.৮ মিলিমিটার হয়। এর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন খুব তাড়াতাড়ি ঘটে। জাইগোট সৃষ্টির ৩০-৪৫ মিনিট পরই **ক্লিভেজ** শুরু হয়। ক্লিভেজ **মেরোব্লাস্টিক** ধরনের। কোনো প্রাণীর ডিমে যখন ভেজিটাল পোলে (মেরুতে) বেশি পরিমাণে কুসুম থাকায় সম্পূর্ণ ডিমটি ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হতে পারেনা তখন নিষিক্ত নিউক্লিয়াসটি কুসুমের পৃষ্ঠতলে একটি ক্ষুদ্র অংশে আশ্রয় নিয়ে ক্লিভেজের প্রস্তুতি নেয়। অংশটি ক্রমশ একটি ছোট ঢিবির মতো দেখায়। এ অংশের ভিতর ক্লিভেজ ঘটে। এ ধরনের ক্লিভেজকে **মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ** (meroblastic cleavage) বলে।

ক্লিভেজ শুরু হওয়ার পর নিউক্লিয়াসটি ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ এমন সংখ্যক কোষে বিভক্ত হতে থাকে। ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট প্রত্যেক কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ভ্রূণটি এসময় এক থোকা আঙ্গুরের মতো দেখায়। এর নাম **মরুলা** (morula)। ভ্রূণের পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মরুলা ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেশি ঝাঁকুনিতে ভ্রূণ কুসুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ব্লাস্টোমিয়ারগুলো আরও বিভক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়ে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) নামক এককোষীয় স্তরে বিন্যস্ত হয়। ক্লিভেজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর মাঝে একটি ফাঁপা জায়গা সৃষ্টি হয়ে বৃদ্ধি পায়। এ ফাঁপা স্থানটি হচ্ছে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel)। ভ্রূণকে তখন **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে।

ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলো প্রথম দিকে কুসুমের উপর টুপির মতো বিন্যস্ত থাকে। কোষ বিভাজন অব্যাহত থাকায় কোষগুলো কুসুমকে ঘিরে প্রসারিত হয় এবং এক পর্যায়ে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) নামক একটি ছিদ্রপথ ছাড়া সমগ্র কুসুমপিন্ড আবৃত হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য ব্লাস্টোপোরও বন্ধ হয়ে যায়। ব্লাস্টুলা ধীরে ধীরে দ্বিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula)-য় পরিবর্তিত হয়।

গ্যাস্ট্রুলার পিছন দিক থেকে লেজ ও সামনের দিক থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সূচনা হয়। যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয় তার নাম **অর্গানোজেনেসিস**

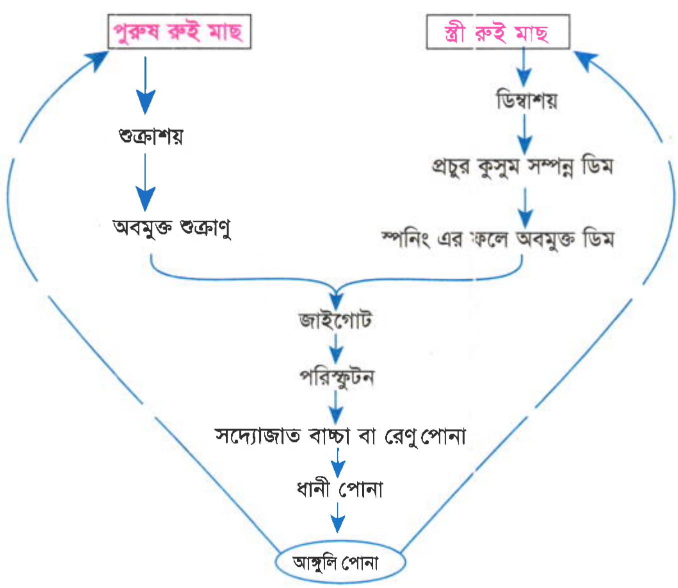

চিত্র ২.৩.২০ : জীবন চক্রের রেখাচিত্র

(organogenesis)। ভ্রূণের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্ধন দেখা দেয় এবং ১৫–১৮ ঘন্টার মধ্যে ডিমের ভিতর থেকে **লার্ভা** (larva) বেরিয়ে আসে। এ লার্ভাকে **ডিমপোনা** বা **রেণু পোনা** বলে।

১. রেণু পোনা (Hatchlings) : ডিম থেকে সদ্য নির্গত লার্ভা থেকে শুরু করে ৭২ ঘন্টা বয়স পর্যন্ত লার্ভাকে **রেণু পোনা** বলে। এ সময় এদের পৌষ্টিকতন্ত্র পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত না হওয়ায় এবং মুখ এক ধরনের পর্দায় আবৃত থাকায় এদের দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত **কুসুমথলি** (yolk sac) থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। কুসুম থলির আকার বেশ বড় এবং এর দুপ্রান্ত সরু হয়। কুসুম থলির সামনে **হৃৎপিণ্ড** অবস্থান করে। ১২ ঘণ্টার লার্ভাতে **চোখ**, দীর্ঘ **নটোকর্ড** ও **পুচ্ছ পাখনা** সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সবগুলো পাখনায় **পাখনা দণ্ড** দেখা যায় এবং **পৌষ্টিকনালির** উদ্ভব ঘটে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কুসুম থলির খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং লার্ভাটি দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ ৭ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়, তখন একে **ধানী পোনা** বলে।

নতুন তথ্য

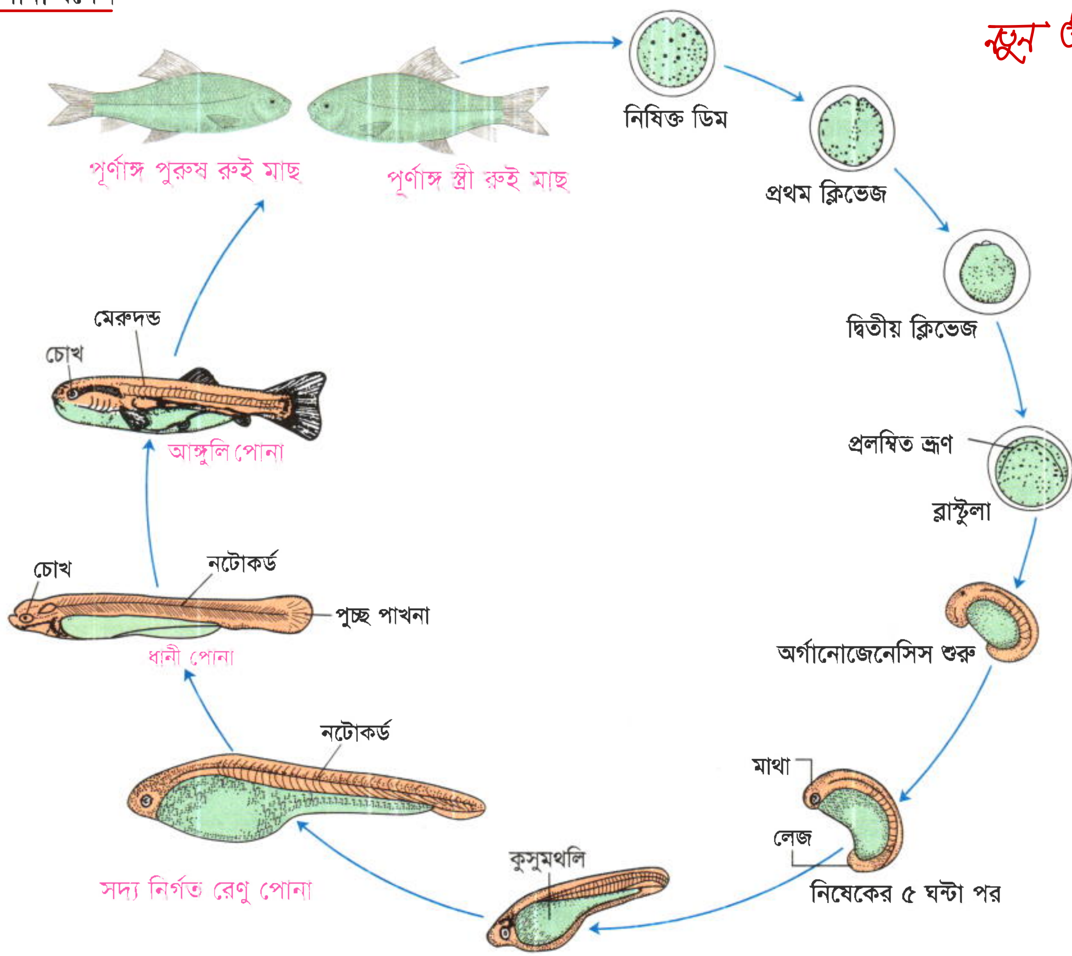

চিত্র ২.৩.২১ : রুই মাছের জীবন চক্রের ধাপসমূহ

২. ধানী পোনা বা ফ্রাই (Fry) : ধানী পোনার বয়সকাল ৭২ ঘণ্টা থেকে ৮ দিন। কুসুমথলি নিঃশেষ হওয়ায় এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের **প্রাণিপ্ল্যাঙ্কটন** (zooplankton) খেয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দশায় এদের **কানকুয়া** (operculum)-র রেখা স্পষ্ট হয়, পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় পাখনার ভাঁজ বাড়তে থাকে, উদর অঞ্চলে **লাল দাগ** দেখা যায়। ধানী পোনা ১২ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

৩. আঙ্গুলি পোনা (Fingerlings) : ৯ দিন বয়স থেকে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত পোনাকে **আঙ্গুলি পোনা** বলে। এদের পৃষ্ঠ-পাখনায় ১৪টি, বক্ষ-পাখনায় ৭টি, শ্রোণি-পাখনায় ৭টি ও পুচ্ছ-পাখনায় ৩০টি রশ্মি সৃষ্টি হয়। ১৫ দিন পর মুখের দুপাশে একটি করে **বার্বেল** (barbel) দেখা যায় এবং পায়ুর অবস্থান স্পষ্ট হয়। ২০ দিন পর দেহ **সোনালি বর্ণের** হয়। আঁইশে দেহ আবৃত হয়ে পড়ে এবং ২৫ দিন পর এতে পরিণত মাছের চেহারা ফুটে ওঠে। আঙ্গুলি পোনা লম্বায় প্রায় ৩০ মিলিমিটার হয়।

৪. ব্রুড মাছ (Brood fish) : ৩০ দিন পর আঙ্গুলি পোনার আঙ্গিক পরিবর্তন ও আকারের পরিবর্ধন ঘটে। সাধারণত দেড় থেকে দুবছর বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। একে **ব্রুড মাছ** বলে।

রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural conservation of *Labeo*)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুষ্টির যোগান দিতে, ঝামেলাবিহীন মাছ পেতে ও স্বাদের দিকে নজর রাখতে রুই মাছের চাষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপক হারে বেড়েছে। বিভিন্ন খামারে যতো উন্নত পদ্ধতিতেই চাষ করা হোক না কেন তাকে ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের দাবী ও প্রচার বেড়েছে অনেক গুণ বেশি। বিভিন্ন হ্যাচারিতে চাষের কারণে সীমিত ও নির্দিষ্ট মাছের মধ্যে যেভাবে অন্তঃপ্রজনন ঘটে তার ফলে যে কোনো মাছের ভাল গুণাবলী হারিয়ে যায়, জিনগত বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়, রোগাক্রান্ত মাছের আধিক্য দেখা দেয় ও স্বাদবিহীন মাছের প্রাচুর্যে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। মাছ থেকে 'মাছের স্বাদ' পেতে হলে মাছকে 'মাছ' হিসেবে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, ভূখন্ড বাড়েনি। অতএব, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অব্যাহত রাখতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জীবের সংকটও বেড়েছে, নদী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং হাওর-বিল-বাওর ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক জননক্ষেত্র ও লালনভূমি বহুগুণ কমে গেছে। তবে এর মধ্যেও কিছু নদী বা তার আশ-পাশ নিয়ে সতর্ক হলে হয়তো কিছু বিশুদ্ধ জিনধারী মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে। তাই পরিবেশগত, প্রজাতিগত ও জিনগত বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

রুই মাছ বাংলাদেশের অতিপরিচিত, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। এটি Cypriniformes বর্গের Cyprinidae গোত্রভুক্ত প্রজাতি। এ গোত্রের মাছগুলো **কার্প জাতীয় মাছ** (carps) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে রুই ছাড়া কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায়। এগুলোকে **বড় কার্প জাতীয় মাছ** বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড় নদী (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, হালদা) ও মূল শাখা নদীতে, কাপ্তাই হ্রদ এবং বিভিন্ন হাওরে রুই মাছ বিস্তৃত।

বড় নদীগুলো হচ্ছে রুই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখি ও ভরা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রুই মাছ নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে মাছের পোনা যখন আঙ্গুলের সমান বড় হয় (আঙ্গুলি পোনা) তখন সংগ্রহ করে মাছের খামারে লালন-পালন শেষে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের এসব অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক উৎস ক্রমশ কমে আসছে (নদী দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ, দূষণ ইত্যাদি কারণে), পানির গুণগতমানও নষ্ট হচ্ছে। ফলে মাছের জিনগত বৈশিষ্ট্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। **হ্যাচারির মাছ কখনও প্রাকৃতিক মাছের প্রতিনিধিত্ব করে না**। বিজ্ঞানীরা তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুই মাছের আবাসস্থলের যথাযথ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ নদীগুলো থেকে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ কারণে, অন্ততঃ বিশুদ্ধ রুই মাছের সংরক্ষণে সবার নজর এখন বাংলাদেশের হালদা নদীর দিকে।

হালদা নদী বাংলাদেশের কেবল দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছচাষীরা পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো দ্রুত ও বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, হ্যাচারীতেতো হয়ই না। এ জন্য এক কেজি রেণু পোনার দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা, যা দেশের অন্য জায়গার পোনার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হালদা নদীকে তাই প্রাকৃতিক জিনব্যাংক সমৃদ্ধ **'মৎস্য খনি'** নামে অভিহিত করা হয়। এ নদীসহ অন্যান্য স্থানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণে প্রথম কাজ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রুই মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ স্থলগুলোকে মৎস্য **অভয়াশ্রম** ঘোষণা করা। লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে মৎস্য অভয়াশ্রম নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

১. মৌসুমি অভয়াশ্রম : নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে নির্দিষ্ট আবাসে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধ প্রজনন ও বিচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট জলাশয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লং জাদু ও বিলাইছড়ি এলাকা। এখানে হালদা নদীর সামান্য একটি অংশকে (মদুনা ঘাট এলাকা) অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। তাও মৌসুমি অভয়াশ্রম। কিন্তু এ নদীতে সারা বছরই কম-বেশি রুই মাছের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় এ নদী অরক্ষিত থাকে তাই মানুষ গোপনে সারা বছরই মা-রুই মাছ আহরণে ব্যস্ত থাকে। অতএব বিষয়টি পর্যালোচনা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ হালদা নদীকে **সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম** ঘোষণা করে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য নদীতে মৌসুমি অভয়াশ্রম কার্যকর হলেও হালদা নদীকে রুই মাছের জন্য সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে হবে।

২. বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা : হালদা নদী রুই মাছের বিশুদ্ধ জিন সংরক্ষণে অবদান রেখে চলেছে। তাছাড়া, এটি একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যা দেশেরই এক প্রান্তে উৎপত্তি লাভ করে দেশেরই এক স্থানে সমাপ্ত হয়েছে। জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ অঞ্চল এমনিতেই খুব সমৃদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। সংবেদনশীলতা ধরে রাখতে পারলে রুইয়ের প্রজনন ও বিচরণ অব্যাহত থাকবে। কেবল কার্পজাতীয় মাছই নয়, হালদা নদী এখন অতিবিপন্ন গাঙ্গেয় ডলফিন বা মিঠাপানির শুশুকেরও প্রধানতম বাসস্থান হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পর্যটনেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি হালদা নদী সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে **হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি** (Halda River Research Laboratory) নামের একটি আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে হালদা নদীকে **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা** হিসেবে ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের কয়েকটি পদক্ষেপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির প্রসার, জলাভূমি কেটে ভরাট, বাঁধ নির্মাণ, যত্রতত্র কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার, পোনা মাছ ও ডিম ওয়ালা মাছ আহরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে, মাছের সংখ্যা ও আবাসস্থল ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তাই এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া অতিব জরুরী। নিচে রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের কয়েকটি পদক্ষেপ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ : রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও প্লাবন ভূমির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঠিক সীমানা নির্বাচন করে **মৎস্য অভয়াশ্রম** তৈরি করে মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধ করা।

২. মা মাছ আহরণ বন্ধ করা : প্রজননকালীন সময় (জুন-জুলাই) অর্থাৎ ডিম ছাড়ার ঋতুতে ডিমওয়ালা মাছ না ধরা বা না মারা। ডিম ছাড়ার সুযোগ দিলে একটি মাছ থেকে লাখ লাখ মাছ পাওয়া যায়।

৩. **কলকারখানার বর্জ্য :** জলাশয়ের নিকটবর্তী কলকারখানার নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ জলাশয়ের পানিতে মিশে যাতে পানি দূষিত না হয় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. **সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ :** জলাশয়ে সম্পূর্ণভাবে সেচ দিয়ে বা বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।

৫. **কীটনাশক ও রাসায়নিক সার :** জলাশয় সংলগ্ন জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এসব দ্রব্যাদি যাতে পানিতে মিশতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৬. **বাজার নিয়ন্ত্রণ :** নির্দিষ্ট মাপের (সাধারণত ৯ ইঞ্চি) নিচে যাতে বাজারে কোনো রুই জাতীয় পোনা মাছ বিক্রি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ :** জলাশয়ে সম্পূর্ণভাবে সেচ দিয়ে বা বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।

৮. **নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি :** নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে সব ঋতুতে পানি প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে।

৯. **প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন পোনা চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করা :** বিভিন্ন নদীতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পোনা সারাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চাষিদের মধ্যে পোনা বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ, প্রশিক্ষণ দেয়াসহ নানারকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

১০. **জনসচেতনতা সৃষ্টি :** জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রুই জাতীয় মাছ চাষের গুরুত্ব বা মাছের গুরুত্ব, মাছের জীবনচক্র, মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত পেপার-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

১১. **মৎস আইন :** মৎস সংক্রান্ত আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা এবং প্রয়োজনে আইন সংশোধন করতে হবে।

১২. **হালদা নদী সংরক্ষণ :** অন্তত: হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ করতে হলে নদীপাড়ে প্রতিষ্ঠিত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধ করতে হবে, মা-মাছ শিকারে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, অপরিকল্পিত বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস গেইট নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং রুই মাছের ডিম ছাড়ার যে নির্দিষ্ট বাঁক রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এ বিষয় পর্যবেক্ষণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে। যে সব নদীতে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া যায় সে সব নদীর পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ যথাযথ হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে রুই মাছের প্রাকৃতিক জননক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী ও প্লাবনভূমিতে রুই মাছ প্রজনন করে থাকে। তবে বেশ কয়েকটি নদী ও প্লাবনভূমিকেই রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো–

১. চট্টগ্রামের হালদা নদী (পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র)।
২. যমুনা নদীর আরিচা, সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ ও ফুলছড়ি ঘাটের নিকটস্থ অঞ্চল।
৩. পদ্মা নদীর রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল।
৪. ময়মনসিংহ শহরের পার্শ্ববর্তী আদি ব্রহ্মপুত্র নদ।
৫. কুষ্টিয়া শহরের পার্শ্ববর্তী গড়াই নদী।
৬. রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াল খাঁ ও মধুমতি নদী। [DAT- 2022-23]
৭. চলন বিল ও টাঙ্গুয়ার হাওরের প্লাবনভূমি।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. রুই মাছের প্রকৃত আবাসস্থল স্বাদুপানির স্রোতযুক্ত নদী বা প্লাবন ভূমি। সেখানে এরা ডিম পাড়ে ও প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বদ্ধ পানিতে এদের প্রজনন ঘটেনা।

২. রুই মাছ শাকাশি। এরা তরুণ ও পূর্ণাঙ্গ দশায় জলাশয়ের মধ্যস্তরের শৈবাল, ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ, পচা আধাপচা উদ্ভিদ কণা খেয়ে থাকে। পোনা অবস্থায় এরা জুওপ্লাঙ্কটন খেতে অভ্যস্ত।

৩. Cypriniformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত মিঠাপানির যেসব মাছের মাথায় আঁইশ থাকে না কিন্তু সারাদেহ সাইক্লয়েড আঁইশ দিয়ে আবৃত থাকে, দেহগহ্বরে পটকা থাকে সে সব মাছকে কার্প-জাতীয় মাছ বলে।

৪. কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে যেগুলো আকৃতিতে বড় (দেড় কেজির বেশি), দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের মেজর কার্প বলে। যেমন–রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ ইত্যাদি।

৫. কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে যেগুলো পরিণত অবস্থায় ছোট ও কম ওজনের তাদের মাইনর কার্প বলে। যেমন-ঘনিয়া, বাটা, টাটকিনি ইত্যাদি।

৬. রুই মাছের আঁইশ সাইক্লয়েড ধরনের। এটি ত্বকের ডার্মাল স্তর থেকে সৃষ্ট এক ধরনের পাতলা, গোলাকার, অস্থি পাতময়, রূপালি বর্ণের গঠন বিশেষ। এটি চুন ও কোলাজেন তন্তু দিয়ে গঠিত।

৭. রুই মাছের মস্তকের পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দুপাশে দুটি লম্বা দাগ থাকে। এদের পার্শ্বরেখা বলে। এতে সংবেদী কোষ থাকে। পার্শ্বরেখার সাহায্যে মাছ পানির কম্পন অনুভব করে পানির বিভিন্ন স্তরে এদের আবাসস্থল নিরূপণ করতে পারে।

৮. যে ধরনের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কখনই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় না এবং শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ভেনাস হার্ট বলে। যেমন-মাছের হৃৎপিণ্ড।

৯. একটি ফুলকা যদি দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে হলোব্রাঙ্ক বা পূর্ণ ফুলকা বলে। আর প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশকে বলা হয় হেমিব্রাঙ্ক।

১০. রুই মাছের মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত সাদা উজ্জ্বল চকচকে প্রাচীর বিশিষ্ট O_2-পূর্ণ থলিকে বায়ুথলি বা পটকা বলে। O_2-ছাড়াও বায়ুথলিতে সামান্য N_2 ও CO_2-থাকে। বায়ুথলি মাছের হাইড্রোস্ট্যাটিক অঙ্গের কাজ করে। এছাড়া এটি আনুষঙ্গিক শ্বসন অঙ্গের কাজ করে।

১১. রুই মাছের বায়ুথলি যে সব ক্ষুদ্র অস্থি দিয়ে অন্তঃকর্ণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাকে তাদের নাম ভেবেরিয়ান অসিকল। এ সংযোগ দ্বারা বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসের পরিবর্তিত চাপ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে পরিবাহিত হয়।

১২. পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা শুক্রাশয় দেহপ্রাচীরের সঙ্গে মেসরকিয়াম দ্বারা ঝোলানো থাকে।

১৩. রুই মাছের ডিম পাড়ার উপযুক্ত পরিবেশের (স্রোতশীল নদী) অভাব হলে পরিপক্ক ডিমগুলো এদের দেহ কর্তৃক শোষিত হয়। এ ঘটনাকে অ্যাটরেশিয়া বলে।

১৪. প্রজনন ঋতুতে মাছের ডিমপাড়া ও শুক্রাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে স্পনিং বলে। স্রোতযুক্ত স্বাদু পানিতে রুই মাছের স্পনিং ঘটে। বদ্ধ পানিতে এদের প্রজনন ঘটে না।

১৫. যেসব ডিম পানিতে ডুবে যায় তাদের ডিমারসাল বলে; আর যেগুলো ডুবেনা তাদের বলা হয় পেলাজিক ডিম।

১৬. ডিম থেকে সদ্য নির্গত বয়স থেকে শুরু করে ৭২ ঘণ্টা বয়স পর্যন্ত পোনাকে রেণু পোনা বলে।

১৭. ৭২ ঘন্টা বয়স থেকে ৮ দিন বয়স পর্যন্ত পোনাকে ধানী পোনা বলে। এটি দৈর্ঘ্যে ১২ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

১৮. ৯ দিন বয়স থেকে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত পোনাকে আঙ্গুলি পোনা বলে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ মিলিমিটার।

১৯. হালদা নদী বাংলাদেশের কেবল দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছচাষীরা পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো দ্রুত ও বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, হ্যাচারীতেতো হয়ই না। এ জন্য এক কেজি রেণু পোনার দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা, যা দেশের অন্য জায়গার পোনার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হালদা নদীকে তাই প্রাকৃতিক জিনব্যাংক সমৃদ্ধ 'মৎস্য খনি' নামে অভিহিত করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রুই মাছের আঁইশের কেন্দ্রীয় অংশের নাম কী ?
ক অ্যানুলী খ ফোকাস গ সারকুলী ঘ রেডিই

২. রুই মাছের কানকোর পেছনের পাখনাকে বলে–
ক শ্রোণিপাখনা খ পৃষ্ঠীয় পাখনা গ বক্ষ পাখনা ঘ পায়ু পাখনা

৩. রুই মাছের আঁইশ কোন প্রকৃতির ?
ক সাইক্লয়েড খ টিনয়েড গ প্লাকয়েড ঘ গ্যানয়েড

৪. ২৫ দিন বয়সী পোনার দৈর্ঘ্য–
ক ১৫ mm খ ১৩ mm গ ১৮ mm ঘ ৩০ mm

৫. ডিম নিষিক্ত হওয়ার কত সময় পর ক্লিভেজ শুরু হয় ?
ক ৩০ – ৩৫ মিনিট খ ৩০–৪৫ মিনিট
গ ২৫ – ৩৮ মিনিট ঘ ২০ –২৫ মিনিট

৬. রুই মাছের প্রজনন সময়–
ক জুন – জুলাই খ মার্চ – এপ্রিল
গ মে – জুন ঘ নভেম্বর – ডিসেম্বর

৭. শ্রোণি-পাখনায় রক্ত সংবহন করে কোন ধমনি ?
ক রেনাল ধমনি খ কডাল ধমনি
গ ইলিয়াক ধমনি ঘ প্যারাইটাল ধমনি

৮. পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা রক্ত গ্রহণ করে--
i. সেগমেন্টাল শিরা ii. রেনাল শিরা
iii. জেনিটাল শিরা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. বাল্বাস আর্টারিওসাস এর বৈশিষ্ট্য হল--
i. ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত হওয়া অংশ
ii. পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত
iii. ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. রুই মাছের জীবন চক্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. পেরিব্লাস্ট ii. ট্রোকোব্লাস্ট iii. এপিব্লাস্ট

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. রুই মাছের হৃৎপিন্ড সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ হল–
i. অ্যাট্রিয়াম ii. ভেন্ট্রিকল
iii. কোনাস আর্টারিওসাস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. রুই মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. পুচ্ছ পাখনায় ১৯টি পাখনা-রশ্মি
ii. লেজ হোমোসার্কাল
iii. রুইমাছে মোট চার ধরনের পাখনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

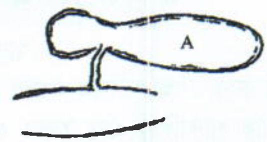

উপরোক্ত চিত্রের মাধ্যমে ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গে কোন গ্যাস পাওয়া যায়–
i. O_2 ii. N_2 iii. CO_2

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৪. চিত্রের অঙ্গটির প্রকোষ্ঠের সংখ্যা কয়টি ?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৭

১৫. অঙ্গটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. বাল্বাস আর্টারিওসাস বিদ্যমান
ii. এক চক্রীয় সংবহনতন্ত্রের অংশ
iii. অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা				
১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	৫. খ
৬. ক	৭. গ	৮. ঘ	৯. খ	১০. খ
১১. ক	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নাজমুল স্যার জীববিজ্ঞান ক্লাসে রুই মাছ পড়ানোর সময় বললেন "মানুষের হৃৎপিন্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং অতি উন্নত। অন্যদিকে রুই মাছের হৃৎপিন্ডে দুইটি প্রধান প্রকোষ্ঠ ছাড়াও একটি উপপ্রকোষ্ঠ আছে, যার মাধ্যমে রুই মাছ স্বাভাবিকভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটিয়ে জীবনধারা অব্যাহত রাখে।

ক) ভেনাস হার্ট কী ? ১
খ) একচক্রী সংবহন বলতে কী বুঝ ? ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত উপপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট প্রাণীর হৃৎপিন্ডের গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত শেষোক্ত প্রাণীর প্রাকৃতিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি লিখ। ৪